মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি. (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাসন্দর্ভ

গবেষক : গৌরাঙ্গদেব ভার্মা

তত্ত্বাবধায়ক : ড. নিখিলচন্দ্র রায়
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

LIBRARY
N.B. DARJEELING

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৯

Th
31.18
সেরা / অমল

233315

18 OCT 2011

PHONE : (0353) 551 482

DEPARTMENT OF BENGALI
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
P. O. NORTH BENGAL UNIVERSITY, DT. DARJEELING, WEST BENGAL, PIN - 734430.

Ref. No... *Date*...................................

Certified that Thesis entitled " মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি " (Maldaher Tangan Nadi-Ababahikar Sahitya-Sanskriti) submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at University of North Bengal is based upon my own work carried out under the supervision of Dr. Nikhil Ch. Ray and that this thesis has not been submitted before any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Nikhil Chandra Ray
Countersigned by Supervisor

Date 24.12.09

Reader
Department of Bengali
North Bengal University

Signature of Candidate

Date 24/12/2009

মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি

মুখবন্ধ

নদীতীরেই সভ্যতার বিকাশ। বাঙালিদের কাছে নদী ধনজনকল্যাণদায়িনী। ভয়ে হোক বা ভক্তিতেই হোক সাধারণের কাছে বেশির ভাগ নদনদীই দেবকল্প। তাই এ দেশে নদীকেন্দ্রিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য। বস্তুত নদনদীকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি বিশেষ মাত্রায় স্রোতস্বিনী।

স্রোতধারার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা নিয়ে টাঙন নদী মালদহ জেলায় নৃত্যরতা। ঐতিহাসিক জনপদ মালদহ জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই নদীর গভীর প্রভাব পড়েছে।

মালদহ জেলার অন্যতম প্রাচীন নদী টাঙন। এর অববাহিকা অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। গাজোল, বামনগোলা, পুরাতন মালদহ ও হবিবপুর ব্লক নিয়ে মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকা অঞ্চলের বিস্তার। এই চারটি ব্লক একত্রে মালদহের বরিন্দ এলাকা নামে পরিচিত। এখানকার টাঙনকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক অজানা তথ্য ছড়িয়ে আছে। মুখ লুকিয়ে আছে নানা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্যময় দুষ্প্রাপ্য ইতিবৃত্ত।

তফশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধরনের মানুষের বাস এখানে। চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সব জেলার লোক এই অঞ্চলে বাস করেন। নেপাল ও ভুটানেরও কিছু মানুষ এখানে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কতিপয় মানুষ জীবিকার তাগিদে এখানে এসে ঘর বেঁধেছেন। বাংলা ভাষার সব উপভাষাই এখানে চলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দিও শোনা যায়। ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা রকম কর্মকাণ্ড এই অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে টাঙন অববাহিকা অঞ্চল ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

তাই বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক স্বার্থে মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সন্ধানপিপাসু নজরের প্রয়োজন ছিল। এগারোটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটি সেই অনুসন্ধানী দৃষ্টির গবেষণালব্ধ প্রচেষ্টা।

বিষয়-বিভাজন-সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ	: টাঙন ও তার অববাহিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক ৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: গদ্য সাহিত্য	৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: ছড়া-কবিতা-গান	১৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: পত্রপত্রিকা	৩৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: লোকগান-পালাগান	৫২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: কথকতা-কবিগান	৮২
সপ্তম পরিচ্ছেদ	: পুরাকীর্তি	৯২
অষ্টম পরিচ্ছেদ	: ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণ	১১১
নবম পরিচ্ছেদ	: লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার	১২৩
দশম পরিচ্ছেদ	: মেলা ও উৎসব	১৩৬
একাদশ পরিচ্ছেদ	: উপসংহার	১৪৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

টাঙন ও তার অববাহিকা

ক) ভূমিকা :

মালদহ জেলার টাঙন নদী বরেন্দ্রভূমির বুক চিরে প্রবহমান। বরেন্দ্র এলাকা পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলের অংশ। তবু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই অংশের গড় উচ্চতা ৪০ মিটার। অঞ্চলটি প্লাইস্টোসিন যুগে অর্থাৎ এখন থেকে ২৫-৩০ লক্ষ বছর আগে সৃষ্ট। পরবর্তী কালে বরেন্দ্র অঞ্চলের উপর দিয়ে কয়েকটি দক্ষিণমুখী নদী প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে টাঙন অন্যতম।

নবীন পলিগঠিত সমভূমির চেয়ে পুরাতন পলিগঠিত সমভূমির উচ্চতা সাধারণত বেশি হয়। তাই বরেন্দ্রভূমির উচ্চতাও বেশি। আর এর ফলে এই এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয় করে একটি অববাহিকা অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। মালদহ জেলার টাঙনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এরকম ক্ষয়জাত একটি নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের অবস্থান লক্ষ করা যায়। এখানে টাঙন নদী একাধিকবার খাত পরিবর্তন করে নতুন খাত সৃষ্টি করে বইতে শুরু করেছে। পরিত্যক্ত খাত সংকীর্ণ-নদী আকারে এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

খ) উৎস :

মালদহ জেলার দক্ষিণবাহিনী নদী টাঙনের উৎপত্তি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ জেলা থেকে। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার রাধিকাপুরের কাছে টাঙন ভারতে প্রবেশ করেছে। মালদহ জেলায় এই নদীর প্রবেশ উইলিয়াম কেরির নীলকুঠিস্থল মদনাবতীর খানিকটা উত্তর-পশ্চিম দিকে।

গ) প্রবাহ :

আইহোতে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিশেছে। তাই মহানন্দার উপনদী টাঙন। গতি পরিবর্তনের ফলে মহানন্দার সঙ্গে মিলনস্থল বারবার বদলেছে।[১] দুটি পরিত্যক্ত জলধারা আছে। একটি গাজোলের চাকনগর থেকে মরা-টাঙন নামে বামনগোলা সেতুকে ছুঁয়ে মূল টাঙনে মিশেছে এবং অন্যটি মূল টাঙনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলেছে, যা চুনাখালি খাল নামে পরিচিত। হবিবপুরের পাথর-হাইতোর থেকে উৎপন্ন হয়ে এই জলধারা বুলবুলচণ্ডী ফেরিঘাটের কাছে মূল টাঙনে মিশেছে।

বুলবুলচণ্ডী রেলসেতুর দক্ষিণে পূর্বমুখী টাঙন মহানন্দার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে সিঙ্গাবাদ স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাদেশের গ্রাম সিক্রামপুরে মহানন্দায় মিশত। ব্রিটিশ আমলে নৌচলাচলের সুবিধার জন্য বুলবুলচণ্ডী রেলসেতুর দক্ষিণ দিক থেকে আইহো পর্যন্ত একটি সোজা ক্যানেল

কাটা হয়। এই পথেই বর্তমানে টাঙন নদী মহানন্দায় এসে পতিত হচ্ছে। তবে টাঙনের পুরাতন খাতটি এখনও স্পষ্ট।

টাঙনে একসময় বারো মাস জল থাকত। সেসময় জলপথই ছিল পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র নদীতীরেই গড়ে উঠত। টাঙনের পথ ধরেই উইলিয়াম কেরি মদনাবতীতে এসে নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন।

এখন টাঙনের উৎসমুখে জলের জোগান কমে গেছে। অন্য দিকে, সেচের জন্য নদী থেকে জল তোলা হয়। তাই শুখা মরসুমে কয়েক মাস টাঙনের বুক মরুভূমির রূপ নেয়। এতে এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচরণে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

ঘ) তীরবর্তী জনপদ :

মালদহে টাঙন-তীরবর্তী চারটি ব্লক আছে— গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর ও পুরাতন মালদহ। ভূমিরূপের বিচারে এই চারটি ব্লকই বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী এখানকার মোট লোকসংখ্যা ৭,৪০,৮০৩ জন। গাজোলে ২,৯৪,৭৪৯ জন, হবিবপুরে ১,৮৭,৫৬৮ জন, বামনগোলায় ১,২৭,২৫৬ জন ও পুরাতন মালদহে ১,৩১,২৩০ জন। পুরাতন মালদহের খানিকটা পুরসভার আওতায় পড়ে। এই পুরসভা গঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে।[২]

টাঙন-তীরবর্তী অঞ্চল এক সময় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মধ্যযুগে উত্তরের দিক থেকে রাজবংশি এবং ছোটনাগপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, পাহান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে বসতি স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদেরও প্রাধান্য আছে। গাজোলের হবিনগর, রানিগঞ্জ; হবিবপুরের আইহো, বুলবুলচণ্ডী; বামনগোলার মদনাবতী, জগদলা ও পুরাতন মালদহের মোরগাঁ-মাধাইপুর টাঙন-তীরের উল্লেখযোগ্য জনপদ।

ঙ) গুরুত্ব :

এক সময় টাঙনের নাব্যতা যথেষ্ট ছিল বলেই নদীতীরে বামনগোলা থানার অবস্থান। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের স্মারক হিসেবে মদনাবতী সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। রানিগঞ্জের রানিগড়ে কীচক রাজার গড় ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা। পাণ্ডুয়া থেকে রানিগড়ের সেতু দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যাতায়াত করা যেত।[৩] টাঙন উপত্যকার অদূরেই আদিনা-পাণ্ডুয়ায় বাংলার রাজধানী ছিল।

প্লাবনভূমি থেকে খানিকটা উঁচুতে টাঙনের অবস্থান। তাই টাল ও দিয়ারার চেয়ে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বেশি। এখানকার ভূমির গঠন ও মাটির ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। টাল ও দিয়ারার অনেকটা গঙ্গা-ফুলহারের ভাঙনে বিপর্যস্ত। এতে মালদা জেলার আয়তনই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু টাঙনে ভাঙন কম।

তাই ভাঙনজনিত বিপদের আশঙ্কাও কম। এজন্য টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ছে।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এখানকার সংস্কৃতি ছিল একমুখী। এখন তা বহুমুখী মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এতে টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে দ্রুত প্রগতি এসেছে। জেলার অন্যান্য ব্লকের তুলনায় বরিন্দের ব্লক-চারটিতে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকেরা স্রোতের মতো এখানে এসে বসতি স্থাপন করে স্থানীয়দের মধ্যে পরিশ্রমমনস্কতা বাড়িয়ে তুলেছেন। কৃষিতে তাঁরা বিপ্লব এনেছেন। এঁদের অনুসরণ করেই স্থানীয়রাও আধুনিক চাষ-আবাদে আগ্রহী হয়েছেন।

কিন্তু এখানকার মানুষের সরলতা কমেছে। আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের পাশাপাশি জীবনযাত্রা যান্ত্রিক ও জটিল হয়ে উঠছে। বাক্যালাপের ধরন ও মাত্রা বদলে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় স্থানীয় আদিবাসী ও রাজবংশি সম্প্রদায় নিজভূমে পরবাসী হয়ে উঠছেন। আঘাত আসছে স্বকীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির উপরে।

তথ্যসূত্র :

১. গৌড়বার্তা ১৪০৫, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০২
২. জানা অজানার মালদহ — ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ, মালদহ পৃষ্ঠা- ২৬
৩. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা- ৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গদ্য সাহিত্য

বাংলা গদ্যসাহিত্য প্রসারের অন্যতম উদ্যোগী উইলিয়াম কেরি এই বরিন্দেই অবস্থান করেছিলেন দু-শো দশ বছর আগে। মদনাবতীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন আরেক গদ্যকার রামরাম বসু। কিন্তু তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে এই জনপদে কোনও গদ্য রচিত হয়েছিল কি না তার নমুনা মেলেনি।

স্বাধীনোত্তর যুগে এখানে ছড়া-কবিতা রচয়িতার তালিকা যতটা দীর্ঘ হয়েছে, গদ্যলেখকদের তালিকা ততটা নয়। এখানকার গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতির সংখ্যা নেহাত কম না হলেও গ্রন্থের সংখ্যা হাতে-গোনা।

মুহা. আব্দুল ওয়াহাব পেশায় গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। ২০০৭-এর জানুয়ারিতে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'বেদনার বালুচর'[১] প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে আটটি গল্প মুদ্রিত হয়েছে। 'স্টাইপেন্ড স্টাইপেন্ড' গল্পে ওয়াকফের ম্যানেজারের হিন্দি সংলাপ বেশ প্রাঞ্জল। প্রকৃত দরিদ্র স্টাইপেন্ড পায় না। "ম্যানেজারের মনে ধরা সুন্দরী যুবতী, যারা চোখে মুখে বুকে সদ্য-ফোটা যৌবনের নোটিশ টাঙিয়ে বেড়ায়" (পৃ.৪) তাদের হাতে চলে যাচ্ছে স্টাইপেন্ডের টাকা। 'হতাশার সাগর-তীরে' গল্পে টাকা ধার না-পাওয়া রফিকের

মর্মযন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে। 'আবিষ্কার' গল্পে সাইকেলে চড়া নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটেছে লেখকের।

গ্রন্থটির সেরা গল্প 'নিষ্ঠুর প্রতিদান'। গল্পটিতে সামরিক জীবনকে ফাঁকি দিয়ে লেখক নীলা নামের একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে নীলা আর লেখককে প্রশ্রয় দেয় না। 'ছেঁড়া ডায়েরির পাতা থেকে' গল্পে এক স্নেহাতুর শিক্ষকের সঙ্গে বকুল নামের এক ছাত্রের অব্যক্ত সম্পর্ক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'বিদায়' গল্পে নিঃসন্তান আমিনা তার ভাসুরের ছেলে মনিরকে বড় করে কলকাতায় পাঠানোর সময় বাৎসল্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। ইয়াসমিন-মাহফুজের প্রেমের উন্মেষ ও তার ট্রাজিক পরিণতিতে 'স্মৃতি বড় বেদনাময়' গল্পটি হয়েছে পুষ্ট। 'দৃষ্টিপথের শেষ সীমানায়' গল্পে দরিদ্র মজুরের ছেলে মাতিন ইদে নতুন জামা পায়নি। মাতিনের মা আমিনার করুণ চোখ দুটি ভরে উঠেছে মাতিনের খেলার সাথী ছেঁড়া গেঞ্জি পরা মইনকে দেখে। এ ভাবেই তাঁর গ্রন্থের শেষ গল্পের সমাপ্তি। ওয়াহাবের গদ্যের বাঁধন দৃঢ়। শব্দচয়নে সংযম আছে। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্স বড্ড দুর্বল।

১৪১৫ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে ফিরোজ সরকার মুন্নার 'সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান'[২]। বামনগোলার পাকুয়াহাটের সংস্কারপিপাসু যুবক ফিরোজের তিনটি গল্প বইটিতে সংকলিত হয়েছে। তিনটি গল্পেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কলমের খোঁচা দিয়েছেন তিনি।

ফিরোজের প্রথম গল্প 'হারেম অথবা প্রথম লিঙ্গ' আকারে বড়। মুসলমান নারীর স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে গল্পের সিংহ ভাগ জুড়ে

আদিরসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন গল্পকার। গল্পের নায়িকা বেগমের প্রথম মিলনে সতীচ্ছদ ফেটে রক্ত বেরোয়নি বলে তার স্বামী হাসু পাড়ায় বিচার বসায়। এজন্য বিচারপতি তাকে পতিতা ও শয়তান বলে অভিহিত করে। আর হাসু তাকে তিন মাসের জন্য তালাক দিয়ে অন্য নারীকে বিয়ে করে। বেগমকে ভিক্ষে করে খেতে বলে। বেগম কিন্তু আর ফেরত যায়নি। বরং নিজে যৌনশিল্পী হয়ে পাড়ায় পুরুষদের মনোরঞ্জন করতে থাকে। পাড়ার সব পুরুষের চরিত্র নষ্ট করার সংকল্প নেয়। কেননা সে উপলব্ধি করেছে, "নারীর তো নিজের ঘর নেই। তাই আবার তালাকের পর অন্য পুরুষের ঘরে যেতে হয়।" (পৃ.২৭)

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পের শিরোনাম 'সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান'। গল্পের নায়ক ইমরান চাকরি না পেয়ে গোরু পাচার করে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আছে। পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে এ গল্পে। অসহায় বৃদ্ধ পিতা আকবর ছেলে ইমরানের পথ চেয়ে বসে থাকেন। তাঁর আর্তি, "পৃথিবীর সব বাপ এক রে। খুদা, পৃথিবীর সব বাপের সব ব্যাটা যেন ভালো থাকে।" (পৃ.৪৪)

'এবং কোরান' গল্পে ধর্মাচরণের চেয়ে মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখিয়েছেন ফিরোজ। গল্পের নায়িকা আনসারি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বাঁকা কথা বলায় তার বাবা ক্ষিপ্ত হন। লেখক ও আনসারির মা আনসারির পক্ষেই মত দিতে গিয়ে ধর্মাচার নিয়ে জটিলতা বাড়ে।

ফিরোজের গল্পগুলিতে সমাজভাবনা স্পষ্ট। তবে ধর্মগ্রন্থের বিরোধিতা করে 'অতি বাস্তব' বিষয় লিখে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন তিনি। ইন্দ্রিয়জ কলার প্রতি বেশি জোর দিতে গিয়ে শব্দচয়নে শালীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গল্পের প্লট নির্মাণে ধর্মগ্রন্থের সরাসরি বিরোধিতা ও রাজনৈতিক নেতাদের নাম না-লিখলেই ভালো হত। প্রথম গল্পের কোনও কোনও অংশ পর্ণো-কাহিনিকেও হার মানাবে।

সমাজসংস্কারের ভাবনা নিয়ে লেখা বামনগোলা থেকে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ মিলেছে। একটি স্বামী গিরিজাত্মানন্দের 'মহাপ্রাণ'[৩] ও অন্যটি জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা'[৪]।

স্বামী গিরিজাত্মানন্দ বামনগোলার গাঙ্গুরিয়ার গ্রামে 'শ্রীশ্রীসারদাতীর্থম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে জনহিতকর কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। গাঙ্গুরিয়ায় এসে সেখানকার যুবক-যুবতীদের স্বচ্ছ মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তুলতে 'মহাপ্রাণ' লেখেন। ১২ জানুয়ারি ২০০৪ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। মুখবন্ধ লিখেছেন মালদহ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার চক্রবর্তী। পাঁচটি পরিচ্ছেদে 'মহাপ্রাণ' সম্পূর্ণ— ক) হে মহাপ্রাণ! ওঠো! জাগো! খ) মানুষ চাই গ) চরৈবেতি ঘ) নীরব কর্ম ও প্রসারিত দৃষ্টি এবং ঙ) মাতৃমুক্তি। প্রতিটি পরিচ্ছদেই স্বামীজির বাণীর বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে পরামর্শ দিয়েছেন, "যদি এগোনোর আগে কেবল

জল্পনা-কল্পনা নিয়ে বেশি সময় কাটে, তা হলে মূল কাজ অনেক দূরে সরে যাবে।" (পৃ.৮)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "মানুষের অন্তররাজ্যের উন্নতির চেষ্টা না-করে কেবল বাহ্যিক সভ্যতার উন্নয়নের জন্য যে-প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে তা অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।" (পৃ.১১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি উৎসাহ দান করে লিখেছেন, "অতীতের সফলতা-বিফলতা কোনওটির উপর আকর্ষিত না-হয়ে, কেবল সামনে এগিয়ে চলার গতিতে বদ্ধপরিকর হওয়া চাই।" (পৃ.১৩)

গ্রন্থটির চতুর্থ পরিচ্ছেদে কর্মের প্রতিদানে প্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "পরের জন্য কর্ম করতে গেলে তো, নিজের জন্য কর্ম করা হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে প্রতিদান, পুরস্কার, অনুপ্রেরণা আর কী হতে পারে?" (পৃ.১৭) শেষ পরিচ্ছেদে প্রাবন্ধিক সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের চিত্তবৃত্তি শোধন করতে চেয়েছেন। কেননা "আমরা শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞানে যতই পারদর্শী হচ্ছি, ততই হয়ে উঠছি কুটিল জটিল লোভী স্বার্থপর।" (পৃ.২৩)

তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য থাকলেও গিরিজাত্মানন্দজীর গদ্য সাবলীল। তবে অনুচ্ছেদের পরিসর ছোটো ও হরফের আকার বড় করলে গ্রন্থটি আরও আকর্ষণীয় হত।

জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা' প্রবন্ধগ্রন্থটিতে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। নেই ভূমিকাও। পিছিয়ে-পড়া মানুষদের রাজনৈতিক ভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিক। দেশে "মরমী সহানুভূতিশীল সরকার" (পৃ.১৮) প্রয়োজন বলে মনে করেছেন তিনি। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের একটি অংশ মুদ্রণ করে তিনি দেখিয়েছেন, উচ্চপদস্থ চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরাই বেশি নিযুক্ত হয়েছেন। ভাষার সাবলীলতা থাকলেও বানান নিয়ে নজর দেননি জীতেন্দ্রনাথবাবু।

গাজোলের শঙ্করপুরের কালীপদ সরকার 'গাজোলের ইতিকথা'[৫] নামে প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন। ২ অক্টোবর ২০০১ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ঢঙে গ্রন্থটির শুরু। কিন্তু এটি আত্মকথনধর্মী প্রবন্ধ। মূলত গাজোল ব্লকের চিত্রাঙ্কন। গ্রন্থটি থেকে অনেক প্রাচীন তথ্য জানা যায়। তবে কয়েকটি বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ দাখিল করলে গ্রন্থটি আরও সমাদৃত হতো।

উর্দুতে 'গজল' শব্দের অর্থ হরিণ-চোখ। এখান থেকে গাজোল ভূখণ্ডের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁর অনুমান। অতি-অনুরাগে তিনি বলেছেন, "গাজোল তুমি সত্যিই হরিণচোখের মতো আকর্ষণীয়।" (পৃ.৯৭) তবে ভাল গল্প-লিখিয়ে কালীবাবু এ গ্রন্থটিকে ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি।

গাজোলের ব্লকপাড়ার শ্রীকৃষ্ণদেব ভার্মা 'মরশুমি ফুলচাষ' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে ভার্মা নার্সারির পক্ষ থেকে ২০০৩-এ প্রকাশ করেছেন।[৬] তিলাসন হাইস্কুলের শিক্ষক শিবেন্দুশেখর মিশ্র বরিন্দের হাজার বছরের ইতিবৃত্তকে টেনে এনেছেন একটি গ্রন্থে। তাঁর 'পায়ে পায়ে হাজার বছর' গ্রন্থটি ২০০৬-এ প্রকাশ করে বুলবুলচণ্ডীর উত্তরণ পুস্তক মন্দির। গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ।[৭]

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না-হলেও বরিন্দের অনেক লেখকই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় বেশ পটু গাজোলের সরকারপাড়ার রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি মুখোপাধ্যায়, জামতলার রফিকুল হক, শিক্ষকপল্লীর বনমালী বর্মন, নয়াপাড়ার নিমাই চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপল্লীর যুগল চক্রবর্তী, কদুবাড়ির লিটন বালো, নালাগোলার পরিমল সরকার, স্বপন চক্রবর্তী, সুমন্ত কীর্তনীয়া, পাকুয়ার শম্ভুনাথ সাহা, কানতুর্কার মণ্টু বর্মন প্রমুখ।

পাকুয়াহাটের সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ অনুকূল বিশ্বাস তাঁর 'টাঙনের পাড়ে দুই বছর'[৮] শীর্ষক স্মৃতিচারণধর্মী প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১৯৫৬-'৫৭ সালে বামনগোলা থানার পাশ থেকে নৌকোতে চেপে টাঙন ও মহানন্দার উপর দিয়ে মালদহ শহরে যাওয়া যেত। বর্ষায় টাঙনকে তাঁর ভরা-যুবতীর মতো লাগতো। শীতে জল কম থাকলেও তার রূপের ঘাটতি হত না। কিন্তু "আজ বুক ভরা পলি নিয়ে তার মান-সম্মান-নাম পর্যন্ত হারিয়ে গ্রামের ঠাকুরমার মতো দাওয়ায় পা-ছড়িয়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।" (পৃ.১)

বামনগোলার অবনীভূষণ মণ্ডলের 'পদ্য নিয়ে গদ্য কথা'[৯], 'পারাপার'[১০], 'কেতুকাকার ডাইরি থেকে'[১১] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প। রহিমুদ্দিন মিঞার 'যবনিকা'[১২], মহেশ্বর ভট্টাচার্যের 'গেরস্থালি'[১৩], গোপালপ্রসাদ সাহার 'ডাকাত বানর'[১৪], বিনয়কৃষ্ণ বোসের 'বকুলতলার চিঠি'[১৫] প্রভৃতি গল্প বেশ সুসংবদ্ধ। বকচরের সুভাষ সরকারের 'শিবডাঙির শিবমন্দির'[১৬] একটি পুরাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। অধীর সরকারের প্রবন্ধ 'পণপ্রথা ও সাহিত্যসমাজ'[১৭], অতুলকুমার মণ্ডলের রম্যরচনা 'কথার কায়দা'[১৮] ও রঘুনাথ বর্মনের ভ্রমণকাহিনি 'সিডাই বাঁধের সমুদ্রসৈকত'[১৯] অনেকটাই সংহত। নালাগোলার অরুণকান্তি বালার 'দ্বিতীয় পংক্তির সন্ধানে'[২০] ও 'বিউটি নামের মেয়েটি'[২১] গল্পদুটির আঙ্গিক অভিনব।

নাট্যরচনাতেও এই জনপদ পিছিয়ে নেই। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইন'[২২], অনীত কুণ্ডুর 'চরৈবেতি'[২৩], প্রবাল লালার 'চেতনা'[২৪], 'উত্তরণ'[২৫] ও 'জীবনরেখা'[২৬] এখানকার উল্লেখযোগ্য নাটক।

তাই টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের গদ্যসাহিত্যচর্চা নিতান্তই অপ্রতুল নয়।

233315

18 OCT 2011

তথ্যসূত্র :

১. বেদনার বালুচর, মুহা. আব্দুল ওয়াহাব, জানুয়ারি ২০০৭, ক্রিসেন্ট পাবলিকেশন, গাজোল, মালদহ

২. সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান, ফিরোজ সরকার মুন্না, ১ বৈশাখ ১৪১৫, প্রকাশক: লেখক নিজেই

৩. মহাপ্রাণ, স্বামী গিরিজাত্মানন্দ, ১ম সংস্করণ, ১২ জানুয়ারি ২০০৪, প্রকাশক : অরুণকুমার মণ্ডল, সম্পাদক: গাংগুরিয়া শ্রীশ্রীসারদাতীর্থম, মালদহ

৪. ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা, জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহেশপুর, মালদহ থেকে প্রকাশিত

৫. গাজোলের ইতিকথা, কালীপদ সরকার, ১ম প্রকাশ, ২ অক্টোবর ২০০১, প্রকাশক: আশুতোষ সরকার, গাজোল, মালদহ

৬. মরশুমি ফুলচাষ — শ্রীকৃষ্ণদেব ভার্মা, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, ভার্মা নার্সারি, গাজোল, মালদহ

৭. পায়ে পায়ে হাজার বছর — শিবেন্দুশেখর মিশ্র, ১ম সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬, উত্তরণ পুস্তক মন্দির, বুলবুলচণ্ডী, মালদহ

৮. লেখকের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত

৯. তরঙ্গ, ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৩, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৯

১০. তরঙ্গ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৮

১১. কোজাগরী, জানুয়ারি ২০০৪, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৬

১২. দীপশিখা, ৪র্থ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৪, নালাগোলা, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১৬

১৩. সাহিত্য শরণি, ৩য় বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ১৯৯০, বুলবুলচণ্ডী মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০১

১৪. কোজাগরী সাহিত্য উৎসব, ৩য় বর্ষ ২০০২, পাকুয়াহাট মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৪

১৫. কোজাগরী, ২০০৯, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৯

১৬. লেখকের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত

১৭. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ আগস্ট ২০০২, বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৩

১৮. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ আগস্ট ২০০২, বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৩

১৯. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২, বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০৩

২০-২৬. লেখকদের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছড়া-কবিতা-গান

সৃষ্টিধর্মী মননের বহিঃপ্রকাশের নির্ভেজাল মাধ্যম ছড়া-কবিতা-গান। মালদহের টাঙন অববাহিকায় ছড়া, কবিতা ও গান শুধু লেখাই হয় না, মানের দিক থেকেও এগুলি যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। বিষয়টিকে দুটি বিভাজনে আলোচনা করা যাক।

১) ছড়া-কবিতা :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে কবি ও ছড়াকারের ছড়াছড়ি। এখানকার এমন কোনও জনপদ নেই যেখানে একজনও কখনও ছড়া-কবিতা লেখেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সব ছড়া-কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে বেশির ভাগ লেখারই মুদ্রণসৌভাগ্য জোটে না। রাশি রাশি পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই সব ছড়া-কবিতা মুখ লুকিয়ে থাকে। সাহিত্যের আসরে কোনও কোনও কবি দু-একটা ছড়া-কবিতা লেখার সুযোগ পান। অনেকে বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারের লোককে শুনিয়েই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

লেখার প্রাচুর্যের নিরিখে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়। গাজোলের জামতলার রফিকুল হক দুটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানুষ এবং মানুষ' ১৯৯৬ এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ৩৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

প্রথম কবিতা 'মানুষ' -এ তিনি জাতিভেদহীন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন।—
"হিন্দুও নই, মুসলিমও নই / কিংবা কোনও বন্য; / মানবকুলে জন্মেছি যে /
মানুষ হবার জন্য।"

'আমরা কিন্তু এখনও' কবিতায় "তরকারি বিহীন ভাতের উৎসবে" যোগ-দেওয়া দারিদ্র্যসংকুল পারিবারিক চিত্র ফুটে উঠেছে। সফদর হাসমির মৃত্যুতে লেখা 'মঞ্চ থেকে মিছিলে' কবিতায় দুনিয়া-কাঁপানো মিছিলের প্রত্যাশা করেছেন কবি।

'আমার জীবন পুড়ে যায়' রফিকুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ছোটো পরিসরের ৪৪টি কবিতা আছে এতে। ২০০৮-এ কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কবির অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে কয়েকটি কবিতায়। এমনই এক কবিতা 'অনাশ্রয়'—

"চারিদিকে পাগল বৃষ্টি, বিপন্ন সময়;
আচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটে
নিটোল নির্মাণ ভেজে
আমার শরীর ভেজে তীব্র অনাশ্রয়ে!"

টুকরো টুকরো ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'একমুঠো গভীরতা', 'খোলাচিঠি', 'জেগে আছি রৌদ্র গন্ধ মেখে', 'খবর', 'যেন বঙ্গোপসাগর' প্রভৃতি কবিতায়। 'লেখা বা না লেখা' কবিতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন — "লেখা বা

না লেখা দুটোই সমান / কখনও না লিখতে পেরে কাঁদে আসমান।" 'মৃত্যুবরণ' কবিতায় তিনি জেনেছেন — "মরতে না চাইলে, মানুষ সহজে মরে না।" 'ভালোবাসা এত কম' কবিতায় তিনি প্রশ্ন তুলেছেন — "এত কম ভালোবাসায় কি ভালো থাকা যায়?" গ্রন্থ-শিরোনামের কবিতা 'আমার জীবন পুড়ে যায়' তাঁর লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। বেকারত্বের জ্বালায় "কবিতাও ছাই হয়ে যায়।" এই যন্ত্রণায় কবি "বরিন্দের ঢেলা হয়ে ক্রমশ একটি এঁদো কুয়োর গভীরতর গর্তে" সেঁদিয়ে যাচ্ছেন। কবিতাটির শেষ স্তবকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি তির্যক ভঙ্গিতে হতাশার বিষোদ্গার করেছেন —

"আর, বেকারত্ব-সকারত্ব যেহেতু সরকারনির্ভর
সেহেতু সরকার চায় বিশ্বস্ত চাকর।
শাসন-শোষণ আদি
অব্যাহত রাখতে — তাকে দরকার,
উদ্ভাবনী বুদ্ধিহীন, প্রশ্নহীন আনুগত্য যার।"

দুটি কাব্যেই রফিকুলের শব্দচয়ন, ছন্দ অলংকার নির্মাণ ও উপস্থাপন-শৈলীতে যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।

গাজোলের বেতপুকুরের অনল বর্মন দুটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষাদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে' ২ আগস্ট ১৯৯৮-এ প্রকাশিত হয়। ২৩টি কবিতার সুসংবদ্ধ সংকলন। কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত ভাবনার উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নময় কল্পনার মূর্ত অবয়ব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম কবিতা 'বিষাদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে'-তে কবি জানান —

"আমার স্বপ্নের সৃষ্টিরা কল্পলোকে ভেসে বেড়ায়
আমি কল্পনাতেই তাদের স্বাগত জানাই,
বাস্তবতার অজুহাতে
তারা স্বীকৃতি পায় না।"

অনলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অনুসূয়া' ১৯০৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম কবিতার নামও 'অনুসূয়া'। প্রথম চারটি চরণেই কবির রোমান্টিকতা ব্যক্ত হয়েছে —

"অনুসূয়া, মধ্য রাতের গাঢ় অন্ধকারে
ব্যোমের সুবিশাল শয্যায় শায়িত নক্ষত্রপুঞ্জের মতো
আমিও শুয়ে শুয়ে জেগে থাকি, আর
তোমার সাথেই গল্প করি অভিন্ন অন্তরঙ্গতায়।"

পেশায় দিনমজুর অনলবাবু দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন —

"দারিদ্র্যের ছোঁয়া
নিষ্প্রভ করেনি আমাকে,
করেছে মহানুভব।" (দারিদ্র্য-ছোঁয়া)

অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করে 'অঙ্গীকার' কবিতায় তিনি লিখছেন —

"দু'বেলা দু'মুঠো পাইনি খেতে
রক্ত করেছি জল,

তাই ঝিনুকের মুক্তা-খোঁজে
পাবই সাগরতল।"

ছন্দ-অলংকার, শব্দচয়ন ও উপস্থাপনার নিরিখে অনলবাবুর দ্বিতীয় কাব্যটি উৎকৃষ্ট।

বামনগোলার পাকুয়াহাটের অনুকূল বিশ্বাস একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি ছড়ার গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। 'ভুলতে পারি কই' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে শিরোনামবিহীন ৭১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০০৯-এ কাব্যটির প্রকাশ। সব কয়টি কবিতাতে চরণান্তিক মিল আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই পর্বের মাত্রা সংখ্যার সাযুজ্য রক্ষিত হয়নি। ছন্দপতন ঘটেছে। কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই ছড়াধর্মী। পাখিকে উপমিত করে তাঁর কয়েকটি কবিতা গ্রন্থটিতে ঠাঁই পেয়েছে। ৪৭-সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখেছেন —

"সেই পাখিটা থেকে থেকে
বলতো আমায় ডেকে ডেকে
তুমি ভালো থেকো,
মনে পড়লে আমার কথা
খুলো তোমার স্মৃতির পাতা
মনে মনে দেখো।"

৬১-সংখ্যক কবিতায় কবি পাখির কাছে জানতে চান —

"ওরে পাখি আমার কথা
শুনতে কি আর পাস,

তুইও কি আজ আমার মতো
বিরহের গান গাস?"

অনুকূল বিশ্বাসের ছড়া সংকলন টক-ঝাল-মিষ্টি ২০০৯-এর মালদহ বই মেলায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম-বিহীন ২৯৫টি ছড়া এতে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৯৩টি ছড়াই চার পংক্তির। অনেকটা হাইকুর মতো। বাকি দুটিতে ৬টি করে পংক্তি। ১৪৪-সংখ্যক ছড়ায় দেশের আইনের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে —

"বিড়ি বেচতে দোষ নেই
ধুমপানে দোষ,
কানা আইন দেখে বড়
হয় আপশোষ।"

১৫১-সংখ্যক ছড়াতে রাজনৈতিক নেতার প্রতি ব্যঙ্গ করে বলেছেন —

"শিক্ষায় যদি অগ্রগতি
নেতার মনে ব্যথা,
শিখলে সবাই লেখাপড়া
চামচে পাব কোথা।"

অনুকূলবাবুর ছড়াগুলিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রতিক বিষয় উঠে এসেছে। শিশুদের পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য প্রবেশ'-এর রচয়িতা তিনি।

গাজোলের নিজগ্রামের প্রদীপকুমার দাস 'সাত রঙ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখে ৯ মে ২০০৭-এ প্রকাশ করেছেন। ব্যতিক্রমী হাড়ের রোগে আক্রান্ত প্রদীপবাবু পঙ্গু হয়ে অনেক বছর ধরেই শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় থেকেও তিনি ১৮টি কবিতার সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কবিতাগুলি মধ্যম মানের। কোনওটি বর্ণনাধর্মী, আবার কোনওটি ছড়াধর্মী। 'নেশার ফল' কবিতায় নেশার ক্ষতিকারক দিক নিয়ে সতর্ক করেছেন তিনি —

"তামাক নেশা বাজে নেশা
নিকোটিনে তার ভরা,
মুখের ক্যান্সার হতে পারে
ফলটা জীবন হারা।"

'শিশুর আহ্বান', 'জয়', 'ভোলা', 'হারিয়ে যাবে', 'আজব দেশ', 'উপদেশ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা। ছন্দ সম্পর্কে কবি সচেতন। প্রত্যেকটি কবিতাই অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত।

গাজোলের বেতপুকুরের স্বদেশ বর্মন ছড়াকার হিসেবেই খ্যত। ছন্দ সম্পর্কে তিনি অতি সচেতন। কোনও কোনও ছড়ায় পল্লীকবি জসীমুদ্দিনের প্রভাব আছে। তাঁর লেখা ছয়টি বই ও দুটি ছড়াপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'জীবননদীর ধারে', 'মেঠো পথের বাঁকে', 'বরিন্দভূমির ছবি', 'দেশ ও দশের হালচাল', 'শহিদ স্মরণে' ও 'সমাজ গড়ার রূপকার' তাঁর ছড়াগ্রন্থ।

'মেঠোপথের বাঁকে' গ্রন্থের 'নতুন বছর' ছড়ায় বিয়োগান্তক সুর ধ্বনিত হয়েছে—

"সুতো কাটা ঘুড়ির মতন বছর যায় যে উড়ে
জীবন চলার লাটাই ছিঁড়ে কোথায় বহু দূরে।
....
হঠাৎ যেন খবর আসে বছর নাকি শেষ-
জীবন পাতায় দিনলিপির আঁকড়ে থাকে রেশ।"

তাঁর দ্বিতীয় ছড়াপত্র (১ ডিসেম্বর ২০০৯-এ প্রকাশিত) -এর 'সমাজের হালচাল' ছড়ায় লিখেছেন —

"নতুন যুগের বইছে হাওয়া খাচ্ছে সমাজটাকে
কোলের শিশু আই লাভ ইউ বলছে বাবা-মাকে।
....
মায়ে-ছায়ে দেখছে ছবি প্রেম নিবেদন রস
শিশুর মনে মারছে ছোবল তাকেও করছে বশ।"

বামনগোলার মদনাবতীর স্বপনকুমার চক্রবর্তী 'কেরি স্মৃতি' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন ২৬ জানুয়ারি ২০০৬-এ। মদনাবতীতে কেরির অবস্থান প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য এই কবিতাটিতে আছে।

'সজাগ' বলে একটি কাব্যগ্রন্থ রুদ্র, বিট্টু ও রাতুল নামে তিন জীবনমুখী কবি প্রকাশ করেছেন, রুদ্রের পাঁচটি কবিতা, বিট্টুর তিনটি কবিতা ও রাতুলের চারটি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। 'সেই ছেলেটি' কবিতায় রুদ্রের

হতাশাবোধ ব্যক্ত হয়েছে। 'সময়' কবিতায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনপথ চলতে ব্যর্থ হয়েছেন বিট্টু। 'পৃথিবী' কবিতায় রাতুলের
পরিবেশচেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

গাজোলের ময়না গ্রামের মজিবর রহমান আঞ্চলিক ভাষায় ভালো মানের কবিতা লেখেন। 'ফুরসত কুণ্ঠিনা পাবু'[১] কবিতায় তাঁর ভাবনাবিন্যাস —

"তমরা কহছেন —
পেথিবীটা নাকি মস্ত বড়;
মোর ত মনে হয় না বাপু,
দিন দিন অর হাড়-পাঞ্জরলা
ভাঙ্গি যাচ্ছে —
একটা পটলা হই যাছে পেথিবীটা।"

গাজোলের রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বছর ধরে কবিতা লেখেন। গদ্যধর্মী কবিতার সংখ্যাই বেশি। তাঁর লেখা সাম্প্রতিক একটি কবিতার অংশ—

"হিংসাকে ঢুকিয়ে রেখেছি আস্তিনে
হিংসাকে ঢুকিয়ে রেখেছি বুকের খাঁচায়
অন্যের আবাদি ক্ষেতে
সবুজের ঢল দেখলে
বাতাসে ফেলতে থাকি হিংসার নিঃশ্বাস!"

(হিংসা)[২]

অনিমেষ দাস গাজোলের তারাতলার কবি। রাজনীতি ও সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লিখতে পছন্দ করেন। তাঁর 'বাংলা ভাষা'[৩] কবিতার শেষ স্তবকে ভাষাপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

"সাজাচ্ছি তাই মাঠটি বিজন
মিষ্টি-খাসা স্বপ্নে ভাসা
ইচ্ছে মতন করছি সৃজন
বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা !!"

বামনগোলার হরিচরণ শিকদার মণ্ডল গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। বেশ পাকা হাত তাঁর। তাঁর 'কান্না বিষয়ক'[৪] কবিতার কয়েকটি পংক্তি —

"কান্নার কোন নাদ নেই দ্রোহ নেই নদীর জলে
দুঃখের মান্দাসা ভাসালেও কালিক দু'চোখে
চিহ্ন মাত্র শোকের ঢেউ থাকে না;
কান্না বলে, আমাকে অঝোরধারা দাও,
চোখ বলে ধুইয়ে দাও দুঃখের কাজল।"

হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডের কবিতা যথেষ্ট পরিণত। তাঁর 'আলোবাজি'[৫] কবিতার প্রথম চারটি ছত্র এখানে উদ্ধার করা হল —

"আড়ম্বর এসেছো সাজিয়ে তোল তবে আমার পূর্ণাহুতি
দম্ভর মতো আগুনে ঢেলে নাভিকুণ্ড পতন

বিষণ্ন আলোয় দীর্ঘকায় জন্ম জেগে উঠুক
বিদ্রোহী ছায়ার সাথে তোমার নৈঃশব্দ ঘিরে মাতাও রোদ্দুর।"

পাকুয়াহাটের পরেশ মণ্ডল লোকায়ত শব্দচয়নে কবিতার বাঁধন দৃঢ় করেন। 'পিদ্দুম জ্বালা'[৬] কবিতার প্রথম চারটি চরণ —

"এই ভর দোপরে
এত আন্ধার ক্যা,
পিদ্দুম জ্বালা
পিদ্দুম জ্বালা ময়না!"

বামনগোলার থিনগরের দেবেন্দ্রনাথ বর্মনকে লোককবি বলা হয়। তাঁর 'বজ্রশূল'[৭] কবিতার দ্বিতীয় স্তবক —

"যুগ হতে যুগ সমাজসম্পদ
লুটিয়ে নিয়েছে ওরা,
সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীতে
হাহাকার আর হাহাকার,
বেকারি সর্বহারা —"

পাকুয়াহাটের বিনয় বোস কবিতা সৃজনের সঙ্গে আছেন বহুদিন। কোজাগরী সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কবিতার পথে তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ান। তাঁর 'ভাস্কর্য'[৮] কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবিতা-রচনার সুপ্ত চেতনা বিন্যস্ত হয়েছে —

"স্বল্প পরিভাষার গুটিকয় শব্দ; কালজয়ী
বর্ণমালায় গেঁথে বৈচিত্র্যের ভেতর চলতে চলতে
এই শৈশব শৈবাল ছেঁড়া কবিতা কখন তৈরি হয়েছে
বুঝতে পারিনি।"

বিষ্ণুপদ মণ্ডল একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। গাজোলের শঙ্করপুরে তাঁর বাড়ি। 'যাদুসোনা' নামে একটি ছড়াপত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁর 'শীতবুড়ি'[৯] ছড়ার চারটি চরণ —

"দিনের বেলা শীতবুড়িটা ঘোমটা দিয়ে ঘোরে
রাতের বেলা ঘোমটা খুলে হাজির সবার দোরে,
ছোট্ট খোকা ছোট্ট খুকি খবর গেছে জেনে
তাইতো দাদু-দিদুর পাশে ঘুমোয় কাঁথা টেনে।"

গাজোলের সুকান্তপল্লীর নরহরি দাস সাক্ষরতা বিষয়ক ছড়ার একটি বই প্রকাশ করেছেন। কবিতাও লেখেন তিনি। তাঁর 'সমস্যা'[১০] কবিতার কয়েকটি চরণ —

"বে-নজির ধরিত্রীর কোলে
সেকেন্ডে শতাধিক শিশু,
পঙ্গু পত্র-পুষ্পহীন কাষ্ঠবৎ!
খরস্রোতা নদীর বুকে দুধ নেই,"

সুশান্ত চক্রবর্তী ছড়া লেখায় বেশ দক্ষ। থাকেন গাজোলের শিক্ষকপল্লীতে। তাঁর 'আজব শহর'[১১] ছড়ার প্রথম দুটি চরণ —

"সুযোগ পেলে দেখো ঘুরে আজব শহর কলকাতা,
দেখবে যত জানবে যত ঘুরবে তোমার মাথা।"

আইহোর প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতায় আধুনিকতার যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাঁর 'ইকো'[১২] কবিতার দ্বিতীয় স্তবক এখানে উদ্ধার করা হলো —

"প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্য
যৌবনের উচ্ছ্বসিত লাস্য
অবাধ্য কামনা মনের
ম্লান হল শূন্য রিক্ত
হতাশায় — দেহের দহন।"

নয়াপাড়ার নিমাই চক্রবর্তী সঙ্গীত রচনার পাশাপাশি কবিতাও লেখেন। তাঁর 'বন্দিনী'[১৩] কবিতার দ্বিতীয় স্তবক —

"পোশাক-ঢাকা দারিদ্র উঁকি দেয়
আনমনা যুবতীর অন্তর্বাসের মতো
তবু বই দেখে নাক সিঁটকে 'মাউস'-এ আঙুল রাখা।"

শিক্ষকপল্লীর অসীমকুমার লাহিড়ী অত্যন্ত দক্ষ কবি ও ছড়াকার। তাঁর 'শিশুর দশা'[১৪] ছড়ার শেষ চারটি চরণে আধুনিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিণাম ব্যক্ত হয়েছে —

"ভোর চারটেয় উঠবে শিশু শুতে যাবে রাত বারোটায়,
নইলে শিশুর প্রতিভাটার সুষ্ঠু বিকাশ করাই যে দায়।
খোঁজাখুঁজির দারুণ ঠ্যালায় শিশুর দশা যিশুর মতো,
শৈশবই তার হারিয়ে গেল হায়রে শিশু ভাগ্যহত!"

গাজোলের নেতাজি সুভাষপল্লীর গৌড়মাধব সিংহ ছড়া-কবিতায় বেশ হাত পাকিয়েছেন। ভিন জেলার সাহিত্য-পত্রিকাতেও তাঁর ছড়া-কবিতা ছাপানো হয়। তাঁর একটি ছড়ার কয়েকটি চরণ —

"পুজো এল, পুজো এল চারিদিকে হল্লা
খেতে মজা পুজোতেই মিহিদানা-গোল্লা।

....

পকেট গড়ের মাঠ, খান বাবু হেঁচকি
গিন্নির গালে হাত খালি ভাতের ডেচকি।

(পুজোর ধারাপাত)[১৫]

বামনগোলার ভূপেন্দ্রনাথ বর্মনের ৩৫ বছর আগে লেখা কবিতা এখনও আধুনিক। সাবলীল গদ্যের বাঁধনে তিনি কবিতার চরণের বিনুনি করেছেন। তাঁর 'কেন এমন হলো'[১৬] কবিতার কয়েকটি ছত্রে এর পরিচয় মিলবে—

"পূর্ণিমার চাঁদের মিতালি
দিগন্তের বাঁশবনে। .....
এখন শুধু অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না

বড় ভালো লাগে। .....

আলো আছে, বাতাস আছে, ভ্রমর আছে

তবু অনেক কুঁড়ি অকালেই ঝরে যায়-

খোঁজ রাখে না কেউ।"

টাঙন অববাহিকার মহিলা কবিদের মধ্যে লিপি সরকার, রেণুকা পাণ্ডে, সুতপা পাণ্ডে, শ্রুতি মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী দাস, আশা প্রসাদ ও মৌটুসী মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। মৌটুসী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবে (২০০৭) স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বেশির ভাগই তাঁর গদ্যকবিতা। তাঁর লেখা ভাষাদিবসকেন্দ্রিক একটি কবিতার শেষ চারটি চরণ—

দিন-রাত্তির মিশ্র শব্দ মগজে পুরে

মাতৃভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি বছর ঘুরে!

বিশ্বায়নের স্বপ্নশাবক রাখছি পুষে,

একটা দিনই গর্বে বলছি — আজ একুশে!

(আজ একুশে)[১৭]

টাঙন নদীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন অমূল্যকুমার সরকার (টাঙনের অঙ্গনে)[১৮], তৃপ্তি শিকদার (টাঙন)[১৯], ত্রিপিসা সিং (টাঙন নদী)[২০], তপতী চক্রবর্তী (অহংকারী টাঙন)[২১] প্রমুখ। নালাগোলার অরুণকান্তি বালার কবিতার হাত পাকা। তাঁর 'মদনাবর্তী' শীর্ষক কবিতা বেশ জনপ্রিয়। সত্তরের দশকে

অধ্যাত্মদর্শন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি কয়েকটি কবিতা লিখেছেন গাজোলের ডা.শ্যামনাথ ভার্মা।

পাকুয়াহাটের ফিরোজ সরকার মুন্না, রাজ্যেশ্বর বিশ্বাস, নালাগোলার পরিমল সরকার, চন্দ্রশেখর চৌবে, কাটিকান্দরের আনেসুর রহমান, মাহিনগরের বীরেশ চক্রবর্তী, হবিবপুরের কল্যাণ বর্মন, বারো মাইলের অবনীভূষণ মণ্ডল, গাজোলের বনমালী বর্মন, নির্মলেন্দু শাখারু, আহোড়ার জীবনকুমার সরকার প্রমুখ কবিতা-ছড়া লেখেন।

২) গান :

একসময় টাঙন অববাহিকার অনেক গান মৌখিক আকারে সজীব থাকত। আজ সেগুলির অধিকাংশই চর্চার অভাবে অবলুপ্ত। তবু স্বরচিত লোকগানের ডালি সাজিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন কতিপয় কবিয়াল। খুব কম হলেও আধুনিক গান, ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক গান, গণসঙ্গীত ও ছড়াগান রচয়িতার বাস এখানে। এইসব গীতিকারের বেশির ভাগই অপেশাদার।

গাজোলের শালুকার সতীশ সরকার সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর প্রচুর গান লিখেছেন। নিজে সুর করে সেসব গান পরিবেশনও করেন। গাজোলে কলেজ হওয়ার পর তিনি যে-গানটি রচনা করেছেন তার দ্বিতীয় অন্তরা —

"আনন্দিত গাজোলবাসী
মুখে সবার উজল হাসি

বেজায় খুশি আদিবাসী
আরও জনগণে।
গাজোল কলেজ স্বপ্নের কলেজ
স্বপ্নপূরণ এতদিনে।"[২২]

সুগায়ক নিমাই চক্রবর্তী কবিতার সঙ্গে গানও লেখেন। তাঁর গানের সুরকার তিনিই। তাঁর লেখা লোক-আঙ্গিকের একটি গানের স্থায়ী অংশ —

"ত্রিলোচন জগৎপতি (আমরা) প্রণাম জানাই তোমাকে,
দয়া করো ওহে প্রভু পড়েছি বিপাকে।
তোমার ষাঁড়ের দলে খাচ্ছে সরষা
তুমি শুনছ বসে নানান কিস্‌সা,
তোমার ডাকলে সাড়া না-পাই আমরা
মর্ত্য থেকে আকাশে।"[২৩]

মদনাবতীর শিবু পুজর লেখেন লোকগান। তাঁর একটি গানের অংশ —

"ঘুর ঘুর হে আরানা মহিষপাড়া
দুবল ঘাসে চরল গেলে
সরবত পানি পিয়েল গেলে রে।"[২৪]

গাজোলের কাটিকান্দরের মদনমোহন মজুমদার, শংকরপুরের অনন্ত মালাকার, চাকনগরের অমূল্য হালদার (সরকার) প্রমুখ বোলকাটাকাটি বা

কবিগান লেখেন। নিজেরা সুরদিয়ে সেসব গান পরিবেশন করেন। অমূল্যবাবুর একটি গানের স্থায়ী ও প্রথম অন্তরা —

"ভজন-সাধন করবি যদি ওরে মন
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা দেহক্ষেত্রে কর স্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ করে সারথী, যুদ্ধে হবে অগ্রগতি
গুরুপদে রেখে মতি, ধনুর্বাণ কর ধারণ।
প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ দখল করো হৃত রাজ্য
ভোগ করিবে সব ঐশ্বর্য শত্রুদের করো নিধন ॥"[২৫]

সরকারপাড়ার আব্দুল ওয়াহাবের লেখা কয়েকটি আধুনিক গানে সুরারোপ করে রেকর্ড করেছেন শিক্ষকপল্লীর শিল্পী জয়া চক্রবর্তী। আব্দুল ওয়াহাবের "এখনও জীবনসন্ধ্যা আমার আসেনি জীবন ঘিরে" গানটি বেশ জনপ্রিয়।

শিক্ষকপল্লীর বনমালী বর্মন একজন প্রতিষ্ঠিত গম্ভীরা-গীতিকার। তাঁর লেখা গান আকাশবাণী ও দূরদর্শনে পরিবেশিত হয়। পরিবেশ-সচেতনতা বিষয়ক একটি গানের সামান্য অংশ —

"যে মাটি মানুষকে দিলে খাদ্য বস্ত্র বিস্তার
বিষ মিশাইয়া সে মাটিকে দিলে নাকো নিস্তার।
নানা হে।"[২৬]

বামনগোলার মণ্টু সাহা খুটাদহের শুকলাল মধু, নবাবনগরের অমূল্যকুমার সরকার, নালাগোলার সুনীল অধিকারী ও সুমন্ত্র কীর্তনীয়া গান রচনার দক্ষ। সুমন্ত্রবাবুর লেখা 'তত্ত্ববীণা' একটি সঙ্গীতগ্রন্থ। শিক্ষকপল্লীর প্রশান্ত সরকার কয়েকটি বাউলগান রচনা করেছেন। গাজোলের ব্লকপাড়ার গৌরাঙ্গদেব ভার্মা একগুচ্ছ ছড়া ও কবিতার পাশাপাশি অজস্র গানও রচনা করেছেন। কলকাতার বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গে তাঁর ছড়া ও কবিতার রেকর্ড আছে।

টাঙন অববাহিকার সঙ্গীতময় জনপদে সাহিত্যসৃজনের যে-ঐকতান সেখানে গীতিকারদের অনবদ্য ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে।

তথ্যসূত্র :

১. আঞ্চলিক ভাষার কবিতা ২০০২, সম্পাদনা: মধুমঙ্গল বিশ্বাস। দৌড় প্রকাশনা, মিলনপল্লী, উত্তর চব্বিশ পরগনা। পৃষ্ঠা-৭৮

২. কোজাগরী ২০০৯, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-০৭

৩. সাহিত্যসঙ্গ, নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-খ৪

৪. দীপশিখা, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৪, নালাগোলা ৩৮

৫. কোজাগরী, জানুয়ারি ২০০৪, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-০৩

৬. তরঙ্গ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১১

৭. তরঙ্গ, জানুয়ারি ২০০৩, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১২

৮. ছুটি সাহিত্যবাসর ২০০৮, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৫৬

৯. যাদুসোনা, চতুর্থবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-০৪

১০. উত্তরণ সাহিত্য ১৯৯৮, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-১২

১১. ফজলি, শারদ সংখ্যা ১৪০৯, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২১

১২. অর্ঘ্য, বুলবুলচণ্ডী থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২৫

১৩. অর্ঘ্য, (চন্দ্রাবতী সাহা বিদ্যাপীঠের পত্রিকা) ২য় সংখ্যা, চাঁদাহার থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২০

১৪. ফজলি, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪০৮, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-১৭

১৫. ফজলি, শারদ সংখ্যা ১৪০৭, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৬

১৬. টাঙনের ঢেউ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৪, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ৪-৫

১৭. উজ্জ্বলনীলমণি, সংখ্যা ১, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা-১৭

১৮-২১. কবি লিখিত পাণ্ডুলিপি

২২. গাজোল মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ২০০৮-০৯ পৃষ্ঠা-৩৯

২৩ গীতিকার লিখিত পাণ্ডুলিপি

২৪. গীতিকারের কাছে শোনা

২৫. একালের ধৃতি, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-২৪
সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত পৃষ্ঠা-৯২

২৬. গাজোলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রুদ্রবীণা' -এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পত্র-পত্রিকা

পত্র-পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বাধীন ও সৃজনশীল ভাবনার প্রতিফলন। সাহিত্যপত্র যেমন কবি-লেখকদের সৃষ্টিময় মননের বিন্যাসে কলেবর ধারণ করে, সংবাদপত্র তেমন জানা-অজানার সংস্করণ নিয়ে পাঠকদের কাছে উদ্ভাসিত হয়।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চল তফশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত পিছিয়ে-পড়া জনপদ হলেও এখান থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। এ পর্যন্ত তিন ডজনেরও বেশি পত্র-পত্রিকা এই চত্বর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান যে কোনও প্রগতিশীল জনপদকে ঈর্ষান্বিত করতে পারে। তবে এখানকার বেশির ভাগ পত্র-পত্রিকাই অনিয়মিত। অধিকাংশ সাহিত্যপত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সাহিত্যপত্র :

টাঙনকে কেন্দ্র করেই অন্তত পাঁচটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'টাঙনের ঢেউ' প্রাচীনতম। ১৯৭৪ -এর মার্চে দীপেন্দ্রনাথ বর্মন ও বিনয় প্রামাণিকের সম্পাদনায় বামনগোলা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যপত্রিকাটি প্রকাশের পেছনে হিমাংশুকুমার ঝা, ভূলোকেশ্বর সরকার, সোমেশ সিদ্ধান্ত, চিন্তাহরণ বিশ্বাস, ভূপেন্দ্রনাথ বর্মন, সমীরণ রায়, দীপ্তিময়

সরকার, অচিন্ত্যকুমার রায়, রামনারায়ণ ভকত, হরেশ মণ্ডল, সুদাম বর্মন, সুনীলেশকুমার সিন্‌হা, শচীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। বিমল সরকার, সবুজ বসু, শম্ভুনাথ সাহা প্রমুখের গল্প-কবিতা পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশে উদ্যামের অভাব না-থাকলেও দ্বিতীয় বার পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়নি।

রাজ্যেশ্বর বিশ্বাস সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'তরঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ। পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা লোককবি দেবেন্দ্রনাথ বর্মনকে ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রধান শিক্ষক সুনীলেশকুমার লালাকে উৎসর্গ করা হয়। ত্রৈমাসিক বলা হলেও পত্রিকাটির প্রকাশ বেশ অনিয়মিত। অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় তরঙ্গের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৭ জানুয়ারি ২০০৩-এ। দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয় ছাপা হয় মলাটের প্রথম পাতায়। এটি একটি অভিনব আঙ্গিক। ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের পাশাপাশি সাঁওতালি ভাষায় লেখা কবিতা এই পত্রিকার বিশেষ সংযোজন।

হরিপদ বিশ্বাসের সম্পাদিত 'টাঙনের কল্লোল' (দাল্লা থেকে প্রকাশিত), বিনয় প্রামাণিক সম্পাদিত 'টাঙন' (পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত) ও শম্ভুনাথ সাহা সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা 'ত্রিস্রোতা' (১৯৭২-৭৩) টাঙনকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্র। এখন আর এগুলি প্রকাশিত হয় না।

আশির দশকের শেষে প্রকাশনার তারিখবিহীন 'অর্ঘ্য' নামে একটি সাহিত্যপত্র বুলবুলচণ্ডী থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মূলত ২২ জন কবির কবিতা-সংকলন। সম্পাদনা করেছেন ষষ্ঠীচরণ সরকার ও অমরেশ হালদার। সুজিত সরকার, প্রবাল লালা, রবীন্দ্রনাথ তরফদার, প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতা এতে মুদ্রিত হয়েছে।

১৪০১ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমীতে 'দীপশিখা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। নালাগোলা থেকে কনককান্তি পালের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ১৪০৪-এর শারদসংখ্যায় রহিমুদ্দিন মিঞার গল্প ও সুভাষ ধর, তপনকুমার দাস, যদুপতি তালুকদার প্রমুখের কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। এই সংখ্যায় 'স্বাধীনতা ৫০' শিরোনামে দু'জন কবির দুটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে সম্পাদিত 'কল্পতরু' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬-এ। পত্রিকাটিতে কবিতা, ছড়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়। তবে বাইরের লেখক-কবিদের লেখাই বেশি। মধ্যম কেন্দুয়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত 'কোজাগরী' একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যপত্র। দশ বছর ধরে এই পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করছেন বিনয়কৃষ্ণ বোস। তাঁর সম্পাদকমণ্ডলীতে শম্ভুনাথ সাহা, অজিত বিশ্বাস, অবনীভূষণ মণ্ডল, বিদ্যুৎ দাস, অনুকূল বিশ্বাস, সমীররঞ্জন বিশ্বাস, ফরিদ হোসেন, ফিরোজ সরকার মুন্না প্রমুখ

যুক্ত আছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, কৌতুক, নাটিকা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি প্রকাশিত হয় এতে। পত্রিকাটিতে যথেষ্টই যত্নের ছাপ আছে। গ্রামীণ হলেও দক্ষিণবঙ্গের শহুরে পত্রিকাগুলির নিরিখে 'কোজাগরী' কোনও অংশে কম নয়। 'কোজাগরী' ২০০৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে মানবধর্মের প্রতি জোর দিয়ে সারা বিশ্বে দ্বিদলীয় সমাজব্যবস্থা প্রত্যাশা করা হয়েছে। (পৃ.২)

স্থানীয় কবিদের নিয়ে বিনয়বাবু গড়ে তুলেছেন 'কোজাগরী সাহিত্য পরিষদ'। পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর কোজাগরী পূর্ণিমার পরের রাতে স্থানীয় ও আমন্ত্রিত কবিদের নিয়ে সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে 'কোজাগরী সাহিত্য উৎসব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সারা রাতব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। ২০০০ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে এই উৎসব চলছে।

ফিরোজ সরকার মুন্নার 'মেঠো কবিতার কালপত্র' ও 'মেঠো ধূলি' সাময়িক পত্র-দুটিতে বেশ কিছু প্রতিবাদী কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। আদি রসাশ্রয়ী ভাবনা নিয়ে লেখা কবিতা 'বউকে নিয়ে জঙ্গলে', 'প্রিয়াঙ্কা গান্ধী', 'মরণ' এতে ঠাঁই পেয়েছে। টাঙন নদীও কবিতায় প্রসঙ্গায়িত হয়েছে। ওলন্দর থেকে প্রকাশিত মেঠো কবিতার কালপত্রের প্রকাশক রাধেশ্যাম বর্মন। ফিরোজের আর একটি সাময়িক পত্র 'পিয়াসা, তোমাকে'- তে পনেরটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। ২০০১-এ রাধেশ্যামবাবুই এটি প্রকাশ করেন।

লিপি সরকারের 'নূরজাহান' (নওপাড়া, ২০০২), রাধেশ্যাম বর্মন সম্পাদিত দেয়ালপত্রিকা 'জবানী' (ওলন্দর, ১৯৯০) ও প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী সম্পাদিত 'প্রগতি' (ঋষিপুর, ১৯৫৪) কিছুদিন জ্বলেই নিভে গেছে। অরুণ বালা সম্পাদিত দেয়ালপত্রিকা 'নবারুণ' (নালাগোলা, ১৯৭৮) ও সাহিত্যপত্রিকা 'অঙ্কুর' (নালাগোলা, ১৯৮৫) প্রকাশের পরেই বন্ধ হয়ে যায়। আইহোর সৃজনী গ্রন্থাগারে ১৯৫৮ সালে দু-বার দেয়ালপত্রিকা 'সৃজনী' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গ্রন্থাগারে সাহিত্যবাসর বসত।

রবীন্দ্রনাথ তরফদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাহিত্য শরণি' ১৯৮৮ থেকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত। বুলবুলচণ্ডীর কেন্দুয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সুজিত সরকার ও অমরেশ হালদার এই সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরে তাঁরাই বুলবুলচণ্ডীর 'রঙ্গম গোষ্ঠী'র পক্ষ থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন। স্থানীয় নিউ সরকার প্রেস থেকে 'সাহিত্য শরণি' মুদ্রিত হত। সাহিত্যপত্রিকা হলেও নিয়মিত বিজ্ঞাপনের অভাব হত না। গ্রামীণ জনপদে পুরোপুরি ভাবে সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা একটানা চালানোর কৃতিত্ব বুলবুলচণ্ডীর এই পত্রিকারই প্রাপ্য।

মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পাঞ্চজন্য' গাজোলের প্রাচীনতম সাহিত্যপত্র। ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে কয়েকটি সংখ্যা বেরনোর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে ১৯৯৭-এ রফিকুল হক ও অনিমেষ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উত্তরণ সাহিত্য'। এটিও গাজোল থেকে প্রকাশিত।

সূচনা সংখ্যায় গল্প, ছড়া ও কবিতা ছাড়াও পুর্ণেন্দু পত্রী স্মরণে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন পবিত্র কুণ্ডু। পরের বছর এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ৪৭ জন কবির কবিতা মুদ্রিত হয়। এর পর আর পত্রিকাটির কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। কোনও উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গাজোল থেকে 'সাহিত্যসঙ্গ' নামে একটি পুস্তিকা-পত্র কখনও কখনও প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯-এ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। আগে অনিমেষ দাস সম্পাদনা করতেন। এখন সম্পাদনা করেন জীবনকুমার সরকার।

গাজোল থেকে প্রকাশিত 'ফজলি'র পথ চলা শুরু হয় ১৪০৬ বঙ্গাব্দ থেকে। ছোটোদের উপযোগী ছড়া, কবিতা ও গল্পের সমাহারে সমৃদ্ধ এই সাহিত্যপত্রের সম্পাদক নির্মলেন্দু শাখারু। প্রতি বছর দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গ্রীষ্মসংখ্যা ও শারদসংখ্যা। পত্রিকাটির কার্যনির্বাহী সমিতিতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক যুক্ত আছেন।

বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও মনোরঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত 'যাদুসোনা' প্রকাশিত হচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে। ষান্মাসিক এই পত্রিকাটি মূলত শিশু-কিশোরদের উপযোগী ছড়ায় সমৃদ্ধ। গাজোলের শঙ্করপুর থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

টাঙন-তীরের জনপদে অনিয়মিত হলেও এতগুলি সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন নামজাদা পত্রিকায় লেখেন। এখানকার কয়েকজন কবি কলকাতার প্রথম সারির কবিদের সঙ্গে

'কবিকণ্ঠে কবিতা শীর্ষক' কমপ্যাক্ট ডিস্কে (প্রকাশনা: সৌহার্দ্য ইন্টারন্যশনাল, কলকাতা) ছড়া-কবিতা রেকর্ড করেছেন। বরিন্দের লেখকদের সাহিত্যপত্র প্রকাশের অব্যবসায়িক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাহিত্য-অঙ্কুরোদ্গমের পরিণত ফসল।

সংবাদপত্র :

সংবাদপত্র সমাজের আয়না। টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে এ পর্যন্ত ১২টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'বারিন্দবার্তা' এই এলাকার প্রাচীনতম সংবাদপত্র। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয়। তবে এর প্রথম সংখ্যাটি 'নতুনের ডায়েরি' নামে প্রকাশ করেন সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 'বারিন্দবার্তা' নামে পাক্ষিক হিসেবে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাটির প্রকাশের পিছনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন হুমায়ুন রেজা, গৌরাঙ্গদেব ভার্মা ও সে সময়ের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (গাজোল) প্রশান্ত দাস। গাজোল থেকে প্রকাশিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ এই সংবাদপত্রটি মুদ্রিত হত গাজোলেরই মুক্তা প্রেস থেকে। বছর পাঁচেক পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৬-এ প্রতিষ্ঠিত হয় গাজোল প্রেস সার্কেল। সে বছর থেকেই নিয়মিত ভাবে প্রেস সার্কেলের পক্ষ থেকে পাক্ষিক পত্রিকা 'গাজোলিকা' প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পান সেরাজুল ইসলাম ও গৌরাঙ্গদেব ভার্মা। প্রকাশক শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা। বরিন্দ অঞ্চলে সাড়া

ফেলে দেওয়া এই সংবাদপত্র এখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে অফসেটে ছাপিয়ে আনা এই এলাকার প্রথম সংবাদপত্র 'গাজোলিকা'।

২০০১ থেকে 'অন্তরঙ্গ আলাপন' নামে একটি সংবাদপত্র গাজোলের সরকারপাড়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটিতে সংবাদ ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাপানো হয়। পত্রিকাটি মাসিক।

১০ অক্টোবর ২০০২ থেকে পাক্ষিক সংবাদপত্র 'বিশেষবার্তার' আত্মপ্রকাশ। গাজোল থেকে সত্যনারায়ণদেব ভার্মার সম্পাদনায় এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত। ভারত সরকারের পত্র-পত্রিকা নিবন্ধীকরণ দফতরে নিবন্ধীকরণের সময় পত্রিকাটির নাম বদলে 'সংবাদ দর্শন' হয়ে যায়। ১০ মার্চ ২০০৪ থেকে 'সংবাদ দর্শন' নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রতি মাসের ১০ ও ২৫ তারিখে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে যথেষ্ট বিজ্ঞাপন থাকে। 'সংবাদ দর্শন'-ই এই এলাকার বলিষ্ঠতম সংবাদপত্র। পত্রিকাটির পুজো সংখ্যায় উন্নত মানের কিছু সাহিত্য মুদ্রিত হয়।

১৫ এপ্রিল ২০০৬-এ সেরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় পাক্ষিক সংবাদপত্র 'নবযুগ উত্তরবাংলা' গাজোল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েকটি সংখ্যা বেরনোর পর তা বন্ধ হয়ে যায়। সত্যেন সরকার সম্পাদিত খেলাধুলার

খবর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'মাঠে-ময়দানে'। গাজোল থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হত। দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে।

'বরিন্দবার্তা' নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র ২৩ নভেম্বর ২০০৯ থেকে গৌতম দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। গাজোল থেকে প্রকাশিত এই সংবাদপত্র নবীনতম।

বামনগোলার বারো মাইল থেকে 'জিজ্ঞাসা' নামে একটি বহুমুখী মাসিক পত্রিকা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অতুলকুমার মণ্ডলের সম্পাদনায় ১ আগস্ট ২০০২-এ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই সংবাদ ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা মুদ্রিত হয়। তবে এই পত্রিকাটির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ১ মার্চ। সম্পাদকের এই দাবির নিরিখে পত্রিকাটির বয়স ৫২ বছর।

হবিবপুর ও পাকুয়া ব্লকের সাহিত্যিকদের নিয়ে 'কোজাগরী সাহিত্য পরিষদ' গঠিত হয়েছে। দুটি সাহিত্য পত্রিকার পাশাপাশি এই পরিষদ 'সংবাদ কোজাগরী' নামে একটি সংবাদপত্র বের করে। পত্রিকাটিকে পরিষদের মাসিক মুখপত্র বলা হলেও এলাকার সাম্প্রতিক খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়। বিনয় বোস সম্পাদিত এই পত্রিকায় কবিতা ও চাষিদের উৎসাহ দানের জন্য নিবন্ধও মুদ্রিত হয়। ২০০৯-এর ১৫ মে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ।

'উত্তরাপথ' এই এলাকার মহিলা-সম্পাদিত একমাত্র সংবাদপত্র। ২০০৩-এর ১ জুন থেকে গার্গী আগরওয়ালার সম্পাদনায় পুরাতন মালদহের মঙ্গলবাড়ি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তবে এখন তা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৭৩-এ পাকুয়াহাটের দীপেন্দ্রনাথ বর্মন, 'সীমান্ত' নামে একটি দেওয়ালপত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে সাহিত্য ছাড়াও কিছু স্থানীয় সংবাদ লিখিত হয়েছিল।

অবহেলিত হলেও এ রাজ্যের সংবাদক্ষেত্রে বরিন্দের ব্লকগুলি, বিশেষ করে গাজোল ব্লকের ভূমিকা যথেষ্ট। মহকুমা বা পুরসভা গঠিত না হলেও গাজোলকে সংবাদমাধ্যমগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই এখানে বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমের সাংবাদিকের প্রাচুর্য। সংবাদ প্রশিক্ষণের জন্য এখানে কলকাতা থেকে প্রশিক্ষক এনে শিবিরের আয়োজন করা হয়। 'সংবাদ দর্শন' পত্রিকা প্রতি বছর সংবাদকেন্দ্রিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে পত্রিকার সেরা লেখক, সেরা পত্রলেখক ও সেরা পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়।

টাঙন-তীরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক মুখপত্র প্রকাশ করে। এতে নবীন সাহিত্যিকদের হাতে-খড়ি হয়। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পত্রিকার মান বাড়ানোর জন্য অতিথি-লেখকদের রচনা মুদ্রণ করে। মুচিয়া,

আইহো, বুলবুলচণ্ডী, পাকুয়া, বামনগোলা, চাঁদাহার, গাজোল প্রভৃতি এলাকার কয়েকটি উচ্চ-বিদ্যালয়ের মুখপত্রের বহিরঙ্গের অলংকরণ আকর্ষণীয়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে কারও কারও লেখার মান বেশ ভাল। চন্দ্রাবতী সাহা বিদ্যাপীঠ, গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুল, পাকুয়াহাট এ এন এম হাইস্কুল, বুলবুলচণ্ডী গিরিজাসুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বামনগোলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রায় নিয়মিত বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজ ও গাজোল মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্রের কোনও কোনও লেখার মান যথেষ্ট উঁচু দরের।

অনেক সময় কোনও উৎসব বা বিশেষ কোনও বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এসব এলাকার কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান স্মরণিকা বা মুখপত্র প্রকাশ করে। সাহিত্যের বিস্তৃতিতে বরিন্দের এইসব মুখপত্র বা স্মরণিকার অংশীদারিত্ব যথেষ্ট। গাজোল ব্লক ইউথ পার্লামেন্টারি কমিটি ২০০৭-এর ৬ জুন 'বরেন্দ্র' নামে একটি উন্নত মানের মুখপত্র প্রকাশ করেছে। এটি সম্পাদনা করেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সেবানন্দ পণ্ডা।

পত্র-পত্রিকার উপর ভর করেই টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি অনেকটা গতিশীল হয়েছে।

পত্র-পত্রিকার তালিকা

	সাহিত্যপত্র	সম্পাদক
১।	টাঙনের ঢেউ	দীপেন্দ্রনাথ বর্মন ও বিনয় প্রামাণিক
২।	টাঙনের কল্লোল	হরিপদ বিশ্বাস
৩।	টাঙন	বিনয় প্রামাণিক
৪।	ত্রিস্রোতা	শম্ভু সাহা
৫।	অর্ঘ্য	ষষ্ঠীচরণ সরকার ও অমরেশ হালদার
৬।	নূরজাহান	লিপি সরকার
৭।	মেঠো ধূলি	ফিরোজ সরকার মুন্না
৮।	মেঠো কবিতার কালপত্র	রাধেশ্যাম বর্মন
৯।	তরঙ্গ	রাজ্যেশ্বর বিশ্বাস
১০।	দীপশিখা	কনককান্তি পাল
১১।	কল্পতরু	রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে
১২।	পিয়াসা, তোমাকে	ফিরোজ সরকার মুন্না
১৩।	প্রগতি	প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী
১৪।	সাহিত্য শরণি	রবীন্দ্রনাথ তরফদার
১৫।	সৃজনী (দেয়ালপত্রিকা)	শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়
১৬।	জবানী (দেয়ালপত্রিকা)	রাধেশ্যাম বর্মন
১৭।	নবারুণ (দেয়ালপত্রিকা)	অরুণ বালা
১৮।	অঙ্কুর	অরুণ বালা
১৯।	কোজাগরী	বিনয়কৃষ্ণ বোস
২০।	কোজাগরী সাহিত্য উৎসব	বিনয়কৃষ্ণ বোস
২১।	পাঞ্চজন্য	মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
২২।	উত্তরণ সাহিত্য	রফিকুল হক ও অনিমেষ দাস
২৩।	সাহিত্যসঙ্গ	জীবনকুমার সরকার
২৪।	ফজলি	নির্মলেন্দু শাখারু
২৫।	যাদুসোনা	বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও মনোরঞ্জন কর্মকার

	সংবাদপত্র	সম্পাদক
১।	জিজ্ঞাসা	অতুলকুমার মণ্ডল
২।	সংবাদ কোজাগরী	বিনয়কৃষ্ণ বোস
৩।	উত্তরাপথ	গার্গী আগরওয়ালা
৪।	সীমান্ত	দীপেন্দ্রনাথ বর্মন
৫।	নতুনের ডায়েরি	সেরাজুল ইসলাম
৬।	নবযুগ উত্তরবাংলা	সেরাজুল ইসলাম
৭।	বারিন্দবার্তা	সেরাজুল ইসলাম
৮।	বরিন্দবার্তা	গৌতম দাস
৯।	গাজোলিকা	সেরাজুল ইসলাম ও গৌরাঙ্গদেব ভার্মা
১০।	বিশেষ বার্তা	সত্যনারায়ণদেব ভার্মা
১১।	সংবাদ দর্শন	সত্যনারায়ণদেব ভার্মা
১২।	অন্তরঙ্গ আলাপন	রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩।	মাঠে ময়দানে	সত্যেন সরকার

তথ্য সংগ্রহ এবং সাহিত্যপত্র-সংবাদপত্রগুলির কপি সংগ্রহে সহায়তা করেছেন:

১. প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক, আইহো, মালদহ
২. প্রবাল লালা, সাংস্কৃতিক কর্মী, মধ্যম কেন্দুয়া, বুলবুলচণ্ডী, মালদহ
৩. স্বদেশ বর্মন, সাংবাদিক, বেতপুকুর, গাজোল, মালদহ
৪. সত্যনারায়ণদেব ভার্মা, সাংবাদিক, গাজোল, মালদহ
৫. অরুণকান্তি বালা, শিক্ষক, নালাগোলা, মালদহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লোকগান-পালাগান

লোকগান-পালাগান লোকসমাজের সৃষ্টি। 'লোক' শব্দটির মধ্যে গোষ্ঠীচেতনার ইঙ্গিত মেলে। লোকসমাজের অনেক মানুষ নিরক্ষর হলেও এঁদের সৃজনীশক্তির আলোয় লোকগান-পালাগান পুষ্ট হয়েছে।

লোকগান-পালাগান লিখিত আকারে সংরক্ষণের অভাব। বংশানুক্রমে এই ধারা জিইয়ে থাকে। লিখিত অবয়ব না থাকলেও লোকগান-পালাগান কোনো শৃঙ্খলাহীন বিষয় নয়। তবে মঙ্গলকাব্যের গান, পদাবলি ও কয়েকটি পর্যায়ের লোকগানে লিখিত পাণ্ডুলিপির ওপর আস্থা রাখেন এই ধারার শিল্পীরা। দর্শকশ্রোতার চাহিদা ও সময়ের সঙ্গে সংগতি রাখতে গিয়ে নতুন নতুন উপকরণ এতে ঠাঁই পাচ্ছে।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে মোটামুটি দশটি ধারার লোকগান পরিবেশিত হয়—

১) গম্ভীরা গান
২) চণ্ডীমঙ্গলের গান
৩) মনসাগান
৪) কীর্তন
৫) বাউলগান
৬) খনগান

৭) আলকাপগান

৮) ভাওয়াইয়াগান

৯) যাত্রাপালা ও

১০) অন্যান্য ধারার লোকগান ও পালাগান

১) গম্ভীরাগান :

গম্ভীরার উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেন তার বীজ অত্যন্ত প্রাচীন। অধুনা গম্ভীরা বলতে আমাদের রাজ্যের মালদহ জেলার লোক সংস্কৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়।

মূলত শৈবধর্মকেন্দ্রিক এই উৎসব চৈত্র সংক্রান্তির সময় শুরু হত। গম্ভীরার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্পষ্ট নয়। গম্ভীরার সাধারণ অর্থ প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরি।[১] বিশেষ অর্থে চৈতন্যদেবের পুরীর বাসস্থানকে গম্ভীরা বলা হয়।[২] কিন্তু মালদহ জেলার গম্ভীরার সঙ্গে চৈতন্যদেবের বাসস্থানের কোনও সম্পর্ক নেই। 'গম্ভীর' শব্দটি কারও মতে বৈদিক, কারও মতে দেশি, আবার কারও মতে বিদেশি।

তবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'গম্ভীরা' শব্দটির সঙ্গে গামার গাছের পুজোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে গম্ভীরা সূর্যের উৎসব, শিবের নয়। কেননা কৃষিভিত্তিক সমাজে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল সূর্যের পুজো।

সূর্য হোন বা শিব হোন, গম্ভীরা মূলত মালদহ জেলার শক্তিশালী লোকমাধ্যম। একসময় চৈত্র বৈশাখ মাসে টাঙন-তীরের অনেক গ্রামগঞ্জে

গম্ভীরাকে কেন্দ্র করে একটা সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিবাদী ভাষা জনসাধারণকে সচেতন করে তুলত। গম্ভীরা গানের ভাষা ও পরিবেশনা মানুষকে যথেষ্ট আনন্দ দান করত। জনশিক্ষার এই আকর্ষণীয় লোকসঙ্গীত বিপুলভাবে সমাদৃত হত। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির নামে টেলিভিশন ও রিয়ালিটি শো-এর প্রভাবে গম্ভীরা তো বটেই, গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি যেন কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

অথচ এই গম্ভীরাগানই একসময় মালদহের স্বদেশি আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। অধ্যাপক বিনয় সরকার গম্ভীরাগানের ব্যাপক সংস্কার করেছেন। স্বদেশিযুগের বিশিষ্ট গম্ভীরাশিল্পী মহম্মদ সুফি তাঁর গানে বলেছেন-

"পশুর কাজ করাও মানবগণে
সাহেব এই প্রজা কি আছে তোমার লন্ডনে?"

সমীর খলিফার গম্ভীরাগানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসঙ্গে আছে —

"এ যে হিন্দু মুসলমান ছিল এক আসনে যান
গলাগলি পীরিত করত গাইত গম্ভীরাগান।"

গম্ভীরা যে শুধু বিনোদনমূলক সংস্কৃতি নয় তা ড. বিনয়কুমার সরকারের মন্তব্যে স্পষ্ট- "It will be seen that Gamvira does not merely provide amusement for the people with dance, song and music but it largely helps in awakening in the minds of

men those springs of action that are the main causes of the improvement of literature and the fiend ares." [৩]

প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয় প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত দীর্ঘ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, বেদের যুগ থেকেই গম্ভীরার শুরু। তাঁর মতে, গম্ভীরা মূলত শিব উপাসনারই লোকসংস্করণ।[৪] বৈদিক সাহিত্যে ছাড়াও মহাভারত, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, সিংহলি সাহিত্য, তিব্বতীয় সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গাজনের প্রাচীনত্বের পরিচয় মেলে। গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসেবে শিবপুরাণ, হরিবংশ, ধর্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে হরগৌরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গম্ভীরা উৎসব পালিত হত। মহাভারত ও হরিবংশ গ্রন্থে শিবের উপাসনার প্রসঙ্গ আছে। কবি কালিদাস বর্ণিত শিব-পার্বতীর বর্ণনা থেকে সেই সময়ের শৈবশক্তির পরিচয় মেলে। ভারতের অনেক জায়গাতেই হরগৌরীর পাষাণময়ী প্রতিমা ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

টাঙন-তীরের চারটি ব্লকেই গম্ভীরা অনুষ্ঠানের চল ছিল। এখনও আছে। ড. প্রদ্যোত ঘোষ দেখিয়েছেন, মালদহ জেলায় ২৩৪টি গ্রামে গম্ভীরা অনুষ্ঠান হয়। প্রতিবেশী জেলাগুলিতেও এর প্রভাব পড়েছে।

গম্ভীরাগানের চারটি অঙ্গ- ১) চার ইয়ারি ২) শিববন্দনা ৩) একক ও দ্বৈত গান ও ৪) পালাবন্দি।

অনেকে শিববন্দনা শুরুর আগে মুখপাদ ও চার ইয়ারি এবং পরে টপ্পিং, টপ্পা-ঠুংরি ও রিপোর্টিং পরিবেশন করে থাকেন।

মুখপাদ :

মুখপাদের দুটি অংশ। প্রথম অংশকে ধুয়া ও দ্বিতীয় অংশকে চিতানি বলে। ধুয়াগান আড়াই ফেরের ও চিতানিগান দুই ফেরের।

উদাহরণ :

"হামি করি ছাতাপাটি বর্তমানে সবচেয়ে খাঁটি
যেদিক জলের ছাঁট, ঘুরাই ছাতার বাঁট।
এটাই হামার রাজনীতি।"

(তপন হালদার)

১. চার ইয়ারি :

পালাবন্দি গম্ভীরাগানে চারজন শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এঁদের মধ্যে একজন দক্ষ অভিনেতা ও উচিত-বক্তা। তিনি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে গম্ভীরার মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করে জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলেন। চারজন ইয়ার-বন্ধুর সাহচর্যে বিচিত্র কৌতুকময় রঙ্গচিত্র প্রথম রচিত হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' নাটকে, দাশরথি রায়ের

পাঁচালিতে এর সন্ধান মেলে। এ রকম কাহিনি উপস্থাপনার রীতি গম্ভীরা ছাড়া অন্য কোনও লোকনাট্যে দেখা যায় না।

উদাহরণ :

(১) "চাইকরা মাইয়া করনু বিহ্যা
সুখে জীবন দিবো কাটি,
ছ্যালা ধরা বাসন মাজায়
জীবনটা যে হল মাটি।"

(২) "রাতের বেলা শুয়্যা থাকি
টিনের চালে পড়ে ঢিল,
ডাইন-পেত্নির জ্বালায় হামার
বাঁচা হল মুশকিল।"

(৩) "সুন্দরী দ্যাখ্যা বিহ্যা করনু
বহু ছিল সুন্দর,
ক্যামন কর্যা হইয়্যা গেল
বহু হামার বান্দর।"

(৪) "সরকারি লোক বলছে এসে
বাড়ি বাড়ি ঘুর্যা,
সাক্ষর নাকি হতে হবে
ল্যাখ্যা-পড়া কর্যা।"

(বনমালী বর্মন)

২. শিববন্দনা :

গম্ভীরাসঙ্গীতের প্রথম অংশ বলা হলেও কার্যত দ্বিতীয় অংশ শিববন্দনা। দেবতা হয়েও কৃষক-নেতা বা মোড়ল হিসেবে গম্ভীরার মঞ্চে শিবের আবির্ভাব। বন্দনার মধ্য দিয়ে গম্ভীরার গীতিধর্মী আবেদন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মালদহের গম্ভীরাগানের বন্দনা শুরু হয় "শিব হে" আহ্বানের মধ্য দিয়ে। বন্দনার সময়ে সারাদেহে ছাই মেখে গলায় সাপের প্রতিকৃতি জড়িয়ে মঞ্চে হাজির হন শিব। তাঁর ডান হাতে ত্রিশূল, বাম হাতে ডম্বরু ও মাথায় জটা থাকে। শিবের সঙ্গী হিসেবে কোনও কোনও মঞ্চে বিভিন্ন বেশে দু-তিনজন উপস্থিত হন। এঁদের মধ্যে একজন উচিত-বক্তা থাকেন। এই বক্তার প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিয়ে জনসমক্ষে প্রতিকারের আশ্বাস দেন শিব। এর পরেই "বোম্ ভোলে" বলে আসর থেকে শিব বিদায় নেন।

উদাহরণ :-

"শিব হে করি মিনতি
ত্বরা কর্‌্যা আস হে তুমি পশুপতি ॥"

(বনমালী বর্মন)

৩. একক গান ও দ্বৈত গান :

পুরুষ ও মহিলা এই দুটি চরিত্র নিয়ে দুই পর্যায়ের অভিনয় চলে। গম্ভীরায় সাধারণত মহিলার ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করেন। তবে গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে গম্ভীরায় মহিলাদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে। গাজোলের 'রুদ্রবীণা'-র মহিলা শিল্পীরা এই বিষয়ে প্রথম কৃতিত্বের দাবিদার।

উদাহরণ :

একক গান

"ছ্যালা মাইয়ার জ্বালায়, আর তো বাঁচিনা
কুনঠে গেলে পাব সান্ত্বনা। নানা ॥
হামার বউয়ের চলছে বারোমাস্যা
ছ্যালাদের নিত্যি বায়না।
সুন্দরী বউ লিয়া অ্যানু চেহারা পরিপাটি
বছর বছর ছ্যালা হয়্যা শরিল হল মাটি। নানা হে ॥
(আবার) বহুর অসুখ লিয়া হামি ভুগছি কত যন্ত্রণা ॥
অসুখ-বিসুখ অভাব-জ্বালা সংসার থ্যাক্যা ছুটে না।
খ্যাটা খ্যাটা বুঢ়িয়্যা গেনু, দু'বেলা ভাত জুটে না। নানা হে ॥
এমন কর্য্যা সংসার টানতে আর তো হামি পারি না ॥
শুনেন ওগো দেশবাসী থাকতে হলে হাসি খুশি
একখান ছ্যাল্যা একখানি মাইয়ার বেশি কেহু লিও না ॥"

(বনমালী বর্মন)

দ্বৈত গান (ডুয়েট)

"নারী : যাইয়ো না যাইয়ো না বন্ধুরে
বিদেশে যাইয়ো গো প্রাণ।
পুরুষ : কাইন্দো না কাইন্দো বধূগো
কাইন্দিয়া হইয়ো না আকুল ॥
পুরুষ : বিদেশেতে যেতে হবে
নারী : বন্ধু তোমার কামাই কেটা খাবে।
বিদেশের কামাইয়ে কে দিছ্যে দালান,

বিদেশে যাইয়ো না প্রাণ।

পুরুষ : বধূ তুমি আমার অবুঝ বালা

নারী : বন্ধু তুমি আমার গলার মালা।

পুরুষ : তোমার জন্য আনবো আমি

ঝুমকা আর কানেরি দুল

কাইন্দো না কাইন্দো না বন্ধুগো,

কাইন্দিয়া হইয়ো না আকুল ॥"

(বনমালী বর্মন)

৪. টনটিং :

প্রশংসা বা নিন্দাসূচক কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে টনটিং করা হয়। টনটিংকে গ্রাম্য ভাষায় 'কুচ্চা' বলে। শব্দটি 'কুৎসা'র অপভ্রংশ। 'কুচ্চা' শব্দটি অবমাননাসূচক হলেও প্রশংসনীয় কাজের ক্ষেত্রে টনটিং-এ প্রশংসা করা হয়। আবার নিন্দাসূচক কাজের ক্ষেত্রে টনটিং-এ নিন্দাও করা হয়।

উদাহরণ :

"তোমাকে বিহ্যা কর্য্যা

মরলাম জ্বল্যা পুড়্যা।

হামাকে দ্যাখতে গিয়্যা তোমার বাবা

নিল হাঁরগে মাটি খুড়্যা।"

(নিমাই চক্রবর্তী)

৫. টপ্পা-ঠুংরি :

নামে টপ্পা-ঠুংরি হলেও এক্ষেত্রে ধ্রুপদী সঙ্গীতের কোনও স্বাদ মেলে না। বরং গম্ভীরায় টপ্পা-ঠুংরি পর্যায়ে নিন্দা-কুৎসাই মূল আলেখ্য হয়ে ওঠে। খেউড়ের আদলেও গম্ভীরার টপ্পা-ঠুংরি রচিত হয়।

উদাহরণ:

খেউর পর্যায়

"আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা
তুমি আসছো দোঢ়্যা, ষাঁড়ে চঢ়্যা
একদিনেতেই মজা পাও ভোলা ॥
পিন্‌হ্যা ডোর‍্যাকাটা বাঘছাল,
মাথায় ব্যান্ধাছো জটার জাল।
তুমি ভসম্ মাইখ্যা ফ্যাকম ধর‍্যা,
মুখেতে ভ্যাক্ ভ্যাকম্ বাজাও ভোলা ॥"

(ড. প্রদ্যোত ঘোষ)

উদাহরণ:

টপ্পা পর্যায়

"ভিখারি শিবের সাথে দেব না উমা মাকে
কত কষ্ট পায় যে উমা কৈলাসেতে শিবের সাথে।
দেব না উমা মাকে ॥"

(নিমাই চক্রবর্তী)

• **রিপোর্টিং বা সালতামামি :**

সারা বছর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সরস আলেখ্যকে রিপোর্টিং বা সালতামামি আখ্যা দেওয়া হয়। বন্দনা বা চারইয়ারিতে সূক্ষ্মভাবে সমস্যার ইঙ্গিত থাকলেও সালতামামি অংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ভালো-মন্দ উভয় দিকই বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে বিস্তার করা হয়। এই অংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

টাঙন-তীরের একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা ডাইনি প্রথা। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বনমালী বর্মনের লেখা একটি রিপোর্টিং

"হে নানা। দেখনা একনা হে বরিনের দিকে চ্যাহ্যা,
(আবার) ডাইন প্রথা নত করল মাথা বের হল যে জীর্ণকায়া।
খাবার খোঁজে ব্যস্ত সবাই শিক্ষার অভাব প্রতি ঘরে,
চেতনার নাইকো বালাই অসুখ হলে এমনি মরে। নানা হে ॥
সম্পত্তির লোভে কেহ আত্মীয়কে ডাইন বলে,
যুগ-জমানা বদল্যা গেছে এমনতর কতই চলে।
(আবার) হত্যা করার সুযোগ খুঁজে ডাইনের অপবাদ দিয়া ॥
সমাজটাকে খ্যাছে খুবলে কেহ-কেহ গুনিন সেজে,
সংস্কারের ভেঙে কপাট দেখছে নাকো কেহ বেজে।
গুনিনের ভাওতাবাজির মুখোশটা দাও উন্মোচিয়া ॥
খেত-খামার পতিত র‍্যাখ্যা ধর‍্যাছে সব মদ চুয়ানি,
বাসি মুখেই খ্যাছে কেহ খেজুর খাট্টা আর পচানি ।

দেহে যক্ষ্মারোগ বাসা বাঁধে, অনুকূল পরিবেশ প্যায়া ॥
শিক্ষিত মানুষের কাছে সবাই কিছু আশা করে,
শিক্ষা সাহিত্যে ভালোবাসা পায় যেন প্রতিটি ঘরে ।
আবার বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি দাও সবার কাছে পৌঁছাইয়া ॥"

দুর্গোৎসবের মতোই টাঙন-তীরে গম্ভীরা উৎসব চৈত্রের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। সাহিত্যগুণ, সুরবৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তায় বরিন্দের গম্ভীরা অনেক উঁচু স্থানের দাবিদার। এর কথা, সুর, পরিবেশন-ভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। তাই এখানকার যাত্রায় গম্ভীরাগান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আজও ব্যতিক্রমী।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, হরিদাস পালিত, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব গম্ভীরাগানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এক সময় গম্ভীরাগানকে সমাদর করেছেন ও নানা বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তি।

বরিন্দের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করতে ও সামাজিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে গম্ভীরাগান এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এই সঙ্গীতের মাধ্যমে

ধর্ম, নীতিবোধ সমাজসংস্কার, কুসংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হতে পারে। সমাজচেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গম্ভীরার কোনও বিকল্প নেই।

পাশ্চাত্যসংস্কৃতির দাপটে লোকসংস্কৃতির বেহাল দশা। লোকসংস্কৃতিও পাশ্চাত্যের ধাঁচ অনুসরণ করতে গিয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। এভাবেই লোকসংস্কৃতির প্রকৃত ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বরিন্দের গম্ভীরাগানও সেই পর্যায়ে পড়ে। কোনও কোনও গোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য গম্ভীরাকে ব্যবহার করেন। তাই সেকালের মতো গম্ভীরা আর সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারছে না। ভাষার নিপুণতার অভাব, শব্দপ্রয়োগে শালীনতার অভাব ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতার জন্য গম্ভীরার জনপ্রিয়তা মার খাচ্ছে।

একসময় গম্ভীরা সংক্রান্ত প্রচারে মালদহের 'মালদহ সমাচার' পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।[৫] কয়েকটি পত্রিকা ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় গম্ভীরাগানের ঐতিহ্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলছে। গম্ভীরাসঙ্গীত আঞ্চলিক জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তবে এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজোড়া বিভিন্ন বিষয় পরিবেশন করার সুযোগ থাকায় জনগণের তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে তার কদর বেড়েছে। কিন্তু তথাকথিত গম্ভীরার লৌকিক আদল ছেড়ে বেরিয়ে আসা ও আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া গম্ভীরাগান আদৌ স্থায়িত্ব পাবে না।

বরিন্দের এই মাটির সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে চাই সমবেত আন্তরিক প্রয়াস। নইলে গম্ভীরাগান অচিরেই আধুনিকতার মোড়কে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে।

বরিন্দ এলাকার চারটি ব্লকেই গম্ভীরাগান অতি জনপ্রিয়। হবিবপুরের আইহো গ্রামে বৈদ্যনাথ হালদার গম্ভীরাগান পরিবেশন করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এই গ্রামেরই মণ্টু পাল, তুলসী পাল, তারাপদ লাহিড়ি, নিতাই দাস, সিদ্দিক সেখ, ইন্দ্রদমন শেঠ প্রমুখ গম্ভীরার বিশিষ্ট শিল্পী। গাজোলের উপেন মণ্ডল, বনমালী বর্মন, নিমাই চক্রবর্তী, সুমৌমী পান, বিজিত দাস, এণাক্ষী দাস প্রমুখ দলগত ভাবে গম্ভীরাকে একটা রুচিশীল মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন। ছোটদের মধ্যে ঋত্বিক বর্মন, মধুরিমা দাস ও লীনা কিস্কু গম্ভীরার জনপ্রিয় শিল্পী।

গাজোলের 'রুদ্রবীণা' আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত গম্ভীরা পরিবেশন করে থাকে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানচেতনা, পরিবেশ রক্ষা, তথ্যের অধিকার প্রভৃতি বিষয় গম্ভীরাগানের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এ সংস্থার শিল্পীরা । বরিন্দের সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন সাহা, বনমালী বর্মন প্রমুখ গম্ভীরাগানের খ্যাতিমান গীতিকার। বৈদ্যনাথ হালদার, নিমাই চক্রবর্তী প্রমুখ গম্ভীরার সুর সৃষ্টিতে মগ্ন থাকেন। হবিনগরের দুর্লভ বিশ্বাস তাঁর গম্ভীরায় সব রকম বিষয় উপস্থাপন করেন।

বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে গম্ভীরাগান পরিবেশিত হয়, গাজোলের ভবানীকোঠা, ফতেপুর, ধ্যামধেমা, হাতিন্দা, বামনগোলার বোদরা, হবিবপুরের বুড়িতলা, আইহো প্রভৃতি এলাকায়।

আইহোর গোপাল দাস ও সম্প্রদায় শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গম্ভীরা শুনিয়েছিলেন।[৬]

২) চণ্ডীমঙ্গলের গান :

টাঙন-তীরের অন্যতম লোকসংস্কৃতি মঙ্গলচণ্ডীর গান। একসময় এই এলাকায় গৃহস্থবাড়ির বার্ষিক মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান ছিল এই গান। তবে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় অধুনা এর চল কমেছে।

রাজবংশি, পলিয়া ও দেশি সম্প্রদায়ের বিয়ের সময় অষ্টমঙ্গলা গাওয়ার রীতি এখনও এই এলাকার কোনো কোনো পরিবারে দেখা যায়। এই অষ্টমঙ্গলা বিয়ের দ্বিরাগমন অনুষ্ঠান নয়, আটদিন-আটরাত ধরে চলতে থাকা চণ্ডীমঙ্গলের গান। শেষের দিন মাতৃমুখোশ পরে আয়োজককে নাচতে হয়। যে-মন্দিরে ঘট বসিয়ে পুজো করা হয় তার চতুর্দিকে আয়োজক-গৃহস্থ পরিক্রমা করেন।

পালা-অনুষ্ঠান হিসেবেও মঙ্গলচণ্ডীর গান পরিবেশিত হয় কোনও কোনও জায়গায়। গাজোলের করিমগঞ্জের চৈতন্য বর্মন, বামনগোলার বারিন্দার গোকুল মণ্ডল ও রূপচরণ মণ্ডল চণ্ডীমঙ্গল পালার জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। পাকুয়ার বাহাদিপুর গ্রামের কিষাণ মণ্ডল ও উত্তম রায় মঙ্গলচণ্ডী-পালার খ্যাতিমান পরিবেশক।

টাঙন-তীর থেকেই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের কয়েকটি পুঁথি উদ্ধার করেন ড. সুনীলকুমার ওঝা।[৭]

৩) মনসাগান :

মনসাগান বা বিষহরিগান টাঙন অববাহিকার প্রধান ও জনপ্রিয় লোকগান। মঙ্গলচণ্ডীর গানের মতোই মনসামঙ্গলের গান দলগত মহড়ার ফসল। তিন দিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত এই গান চলে। কোনও কোনও পরিবারের বার্ষিক উৎসবের রূপ নিয়েছে এই পালাগান।

মনসামঙ্গলের চিরাচরিত কাহিনির নাট্যরূপ দেন পালাকারেরাই। পুরুষেরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁদেরই বিকৃত কণ্ঠে অনুরণিত হয় সনকা বা বেহুলার আর্তনাদ।

মনসামঙ্গলের পালাকে জনপ্রিয় ও পরিসরে বড় করার জন্য আজকাল চটুল বাংলা-হিন্দি গান সংযোজন করা হয়। সিন্থেসাইজার, অক্টোপ্যাড প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র মনসাগানে ঢুকে পড়েছে। কখনও কখনও আদি রসাশ্রয়ী কৌতুকও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে ধর্মকেন্দ্রিক গান বলে এর অশ্লীলতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। এই পালায় কৌতুক-অভিনেতার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

পালা পরিবেশনের শুরুতে ঈশ্বরবন্দনার পাশাপাশি গানের মাধ্যমে আয়োজকেরও প্রশংসা করা হয়। শেষের দিন সূর্যালোকে পালা শেষ করতে

হয়। টাঙন-তীরের কয়েকটি এলাকায় মনসার পাকা মন্দিরের অবস্থান। বেশির ভাগ মন্দিরে নিয়মিত পূজো হয় ও বার্ষিক মনসাগানের আয়োজন করা হয়।

বরিন্দ এলাকার প্রাচীনতম মনসামন্দির গাজোলের ময়নায় অবস্থিত। সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফেরাতে স্বর্গে যাওয়ার জন্য নদীপথে ভেলায় পাড়ি দেন। কথিত আছে, ময়নার ঘাটে নেতা ধোপানীর সাক্ষাৎ পান বেহুলা। এখান থেকেই বেহুলা কৈলাস যাত্রা করে স্বামীসহ ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই সংবাদ পেয়ে চম্পকনগর থেকে সপ্তডিঙা সাজিয়ে চাঁদ রওনা হন। পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য । পথে এই ময়নার ঘাটেই রাত্রিবাস করার সময় স্বপ্নাদেশ পান চাঁদ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদ ময়নাতেই নাকি মনসার পূজো দেন। ফি-বছর আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে সপ্তাহ ব্যাপী এখানে পুজো ও মেলার আয়োজন হয়। প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। ভিনরাজ্য থেকেও অনেকে আসেন।

বামনগোলার রাখালপুকুর, নালাগোলা, পাকুয়া, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী, কেন্দপুকুর, আইহো, পুরাতন মালদহের সাহাপুর, বাচামারি, গাজোলের দেওতলা, কাটনা, আহোড়া, মশালদিঘি প্রভৃতি এলাকায় এই পালাগানের বার্ষিক আসর বসে। নিয়মিত চর্চা হয়। বরিন্দের এমন কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত নেই যেখানে মনসাগান হয় না।

পুরাতন মালদহের মানুষদের বিশ্বাস, বেহুলা এখান দিয়ে নদীপথে মৃত স্বামীকে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। তাই এই এলাকায় বিধবার সংখ্যা বেশি।

বিলকাঞ্চনের সঞ্জীব মাহাতো, হবিনগরের শ্যামল সরকার, মুদাফৎ হবিনগরের মনোমোহন মণ্ডল, খোকসনের রাখাল ঘোষ প্রমুখ দলগত ভাবে মনসাগান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন।

৪) কীর্তন :

কীর্তনের দুটি ধারা- নামকীর্তন ও পদকীর্তন। স্বল্প সময়ের কীর্তনের আসরে শুধুই নামকীর্তন পরিবেশিত হয়। মূলত অষ্টপ্রহরের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু চব্বিশ প্রহর থেকে এক শো কুড়ি প্রহর পর্যন্ত যেসব কীর্তনের আসর বসে সেখানে পদাবলি কীর্তন পরিবেশিত হয়। বরিন্দ এলাকায় পদাবলি কীর্তনের কয়েকটি দল আছে। সমবেত ভাবে নামকীর্তন টাঙন-তীরের বেশির ভাগ গ্রামেই চলে।

হবিনগরের প্রফুল্লকুমার রায় পনেরো বছর ধরে পদাবলি কীর্তন পরিবেশন করছেন। বাইরের অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রণ পান। এই এলাকারই দীপালি মণ্ডল ও ফুলমালা রায় পদাবলিতে সুনাম অর্জন করেছেন। চাকনগেরর সুভাষচন্দ্র মণ্ডল বাঁশিতে ও গৌরচন্দ্র মণ্ডল মৃদঙ্গে সহায়তা করে কীর্তনের আসরকে বেশ রসঘন করে তোলেন। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, এমন-কী রাজ্যের বাইরেও আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান করেন। নালাগোলার পরেশ শীল উদাত্ত কণ্ঠে বৈঠকি কীর্তন পরিবেশন করেন। হারমোনিয়াম বাদনেও তিনি দক্ষ।

চাঁদা তুলে শুধু গ্রামেরই নয়, শহরমুখী জনপদগুলিতেও কীর্তনের বার্ষিক আসর বসে। এজন্য এই সব এলাকায় নাটমন্দির গড়ে উঠেছে। কয়েকটি জায়গায় হরিমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও দুর্গামন্দিরকে কেন্দ্র করে পদাবলি কীর্তন আয়োজিত হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের বৈষ্ণব পদ কীর্তনের ভক্তিরসের স্রোতে টাঙন-তীরের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। পদাবলি কীর্তন শুরুর আগে প্রথা মেনে গৌরচন্দ্রিকা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা করা হয়। বাড়িতে কোনও কোনও শুভ অনুষ্ঠানে নাম-কীর্তনের দলকে আহ্বান করা হয়।

টাঙন-তীরের অনেক গ্রামে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের আধিক্য। এঁরা তাঁদের কুলগুরু হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর মূর্তি স্থাপন করে হরিসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের মহানন্দ হালদার, তারকচন্দ্র সরকার, বিজয় সরকার, অশ্বিনী গোঁসাই প্রমুখের পদ এঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। কোথাও কোথাও কীর্তনের শুরুতে ভাগবত পাঠ করা হয়। নালাগোলার মহাদেব মণ্ডল, আনন্দ সরকার, গাজোলের সুধাংশু পাল, নিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ ভাগবত পাঠে দক্ষ।

৫) বাউলগান :

ঈশ্বরভাবনায় দেহে ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠাই বাউল সাধকদের মূল লক্ষ্য। তবে বাউলগান এখন অন্যতম জনপ্রিয় লোকগান। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে দেহতত্ত্বমূলক এই গান পরিবেশিত হয়। কোমরে

ডুগডুগি, পায়ে মল ও পরনে গেরুয়া পোশাক পরে বাউলরা উচ্চগ্রামে এই গান গেয়ে চলেন। একই সঙ্গে পদগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই জাত-বাউল নন।

বরিন্দের চারটি ব্লকেই বাউলগানের ব্যাপক প্রভাব আছে। গাজোলের শিক্ষকপল্লীতে ফি-বছর বৈশাখ মাসে আট দিন ধরে বাউল অনুষ্ঠান হয়। এখানকার পাইল শ্মশান, কদুবাড়ি শ্মশান, কৃষ্ণপুর, রানিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় প্রতি বছর বাউল উৎসবের আয়োজন করা হয়। কাটিকান্দরে শিবরাত্রি থেকে সপ্তাহব্যাপী বাউল উৎসব চলে। পাকুয়ার গোবরাকুড়িতে এই জনপদের বৃহত্তম বাউল মেলা বসে। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। বাউলশিল্পী শঙ্কর চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা।

কাটিকান্দরের গোকুল রায়, চন্দ্রকুমার বর্মন, শিক্ষকপল্লীর প্রশান্ত সরকার প্রমুখ বাউলগানের প্রোথিতযশা শিল্পী।

৬) খনগান :

খনগান প্রকৃতপক্ষে লোকযাত্রা। স্থানীয়ভাবে রাজবংশি, পলিয়া ও দেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গান প্রচলিত। একই ভাষাভাষি অন্যান্য সম্প্রদায়ের, এমন-কী মুসলমানেরাও এই গানে অংশ নেন। গম্ভীরা ও আলকাপের মতো খনেও তাৎক্ষণিক সংলাপ থাকে। উৎসগত ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এই গানের চল বেশি থাকলেও মালদহের টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে এই পালা

চর্চিত হয়। বুলোসরি, ঢাকোসরি প্রভৃতি ঐতিহ্যনির্ভর পালা খনে পরিবেশিত হয়। আজকাল চটকদারি নাম দিয়ে খন উপস্থাপিত হচ্ছে। 'লাইনার পিস্টন, নজেল মার্ডার' এমনই একটি চটকদারি পালার দৃষ্টান্ত।

গাজোলের শিবাজিনগরের নরেন সরকার, ভবানীকোঠার সুবোধ সরকার, ধ্যামধামার মিশন সরকার খনগানের বিশিষ্ট শিল্পী।

৭) আলকাপ গান :

মূলত মুর্শিদাবাদের অন্যতম লোকগান আলকাপ। কিন্তু টাঙন অববাহিকা অঞ্চলেও এর চর্চা আছে। আলকাপের আঙ্গিক হিসেবে কোনও পুজোপার্বণ অনুষ্ঠিত হয় না। আলকাপ কার্যত ব্যঙ্গরঙ্গরসে পরিপূর্ণ লোকপালা। বলা হয়, অবিভক্ত মালদহ জেলার শিবগঞ্জ থানার মনাকষা গ্রামে এর সূচনা। কুশীলবেরা সবাই পুরুষ। পুরুষেরাই নারী সেজে অভিনয় করেন। আলকাপের ভাষায় এঁরা ছোকরা। এঁদের বিপরীত পুরুষ চরিত্রকে ক্যাপাল বা লাব্বার বলে। এঁর উপরে দলের সুনাম-নির্ভর করে। বন্দনাগায়ক দলকে পরিচালনা করেন। এঁকে 'সরকার' বলা হয়। সহকারী নটনটী থাকে। আসরে যাঁরা তবলা, হারমোনিয়াম ও করতাল বাজান তাঁরাও কোরাস ধরেন। এঁদের দোহারি বলে।

বন্দনা অংশে দেবতা ও বাস্তবজীবন দুই-ই প্রাধান্য পায়। যেমন —

ক) "উমা ভবতারা —

শ্রীচরণে স্থান দাও মা তারা।" *(দেববন্দনা)*

খ) "লালটোন হ্যাজাগ লাগবে না ভাই স্বাধীন প্রাঙ্গণে
ও তাই শোনা যায় কানে।" *(বৈদ্যুতিক বাতির প্রেক্ষিতে)*

বাঁশ দিয়েও বন্দনা রচিত হয় —

"ধন্য বাঁশের বলিহরি তাই করব রচনা,
বসে শোনেন গো শোনেন দশজনা।
বড় গুনের জিনিস দাদা
নামটি তাহার বাঁশ,
ঘর-দুয়ারে দেখ তো মোদের
হচ্ছে কত কাজ গো।
ঝাঁপ-টাটি আর হচ্ছে খুঁটি
বলছি কথা খাঁটি খাঁটি।
সারক-সূতা বাওনা প্যালা
ঝড়ের বলে সামলায় ঠেলা।
কত খোয়াড়মারা খাদ
পশুপাখির মারে জানগো।
কৃষ্ণের হাতে মোহন বাঁশি,
ইদুঁর মারা হয় গো ফাঁসি
ভূমিষ্ঠকালে ছেলের কাটে নাড়ি

এবং বাঁশের খায় তরকারি।"

বন্দনার পরে শুরু হয় খেমটা। সাধারণত ছোকরা ও ক্যাপালই এই গান করেন। অন্য কুশীলবও অংশ নেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া নিয়ে তরজা চলতে পারে। নারীস্বাধীনতাকেন্দ্রিক নানা বিষয় বিনোদনমূলক খেমটায় ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের বীরেন সরকার, বুধু সরকার, বাক্কার সরকার, ভগা সরকার প্রমুখের রচনা করা পালা টাঙন-তীরের গ্রামগুলিতে পরিবেশিত হয়। হবিবপুরের ঋষিপুর গ্রামের বলরাম সরকার ও নন্দদুলাল মণ্ডল দলগত ভাবে আলকাপ ও পঞ্চরস পরিবেশন করেন।

তবে আলকাপ ও পঞ্চরস এক জিনিস নয়। সাধারণত সামাজিক, পুরাণকেন্দ্রিক কোনও বিষয় নিয়ে আলকাপের পালা রচিত হয়। ইসলামি চরিত্র থাকে না। খলনায়ক-খলনায়িকাও নায়ক-নায়িকার মতোই প্রাধান্য পান। কাহিনিকেন্দ্রিক পালাকেই 'কাপ' বলা হয়। এই কাপের শেষে সময় বাঁচলে চটুল নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। সারারাত ধরে এই পালাগান চলে।

৮) ভাওয়াইয়া :

কোচবিহারে ভাওয়াইয়া গান সর্বাধিক প্রচলিত। কিন্তু মালদহের টাঙন-তীরেও ভাওয়াইয়ার আংশিক বিকাশ ঘটেছে। দরিয়া ও চটকা এই দুটি ধারাতেই এখানকার শিল্পীরা পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। রাজবংশি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাওয়াইয়া। তবে যথেষ্ট রাজবংশি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ থাকা

সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্তের এলাকা বলে এখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভাওয়াইয়াশিল্পী নেই।

ফতেপুরের ভবতোষ সরকারের ভাওয়াইয়া দল, ধ্যামধামার বৈশিষ্ট্য সরকারের ভাওয়াইয়া দল, আহোড়ার টুম্পা বর্মনের ভাওয়াইয়া দল এই জেলায় খ্যাতিলাভ করেছে। রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতাতে এখানকার কয়েকজন শিল্পী এককভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

৯) যাত্রাপালা :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে দু-ধরনের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয় - ক) শখের যাত্রা ও খ) পেশাদারি যাত্রা।

ক) শখের যাত্রা :

এ এলাকার বিভিন্ন গোষ্ঠী, ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কখনও কখনও শখের যাত্রা পরিবেশন করে। কোনও পুজো বা উৎসবকে কেন্দ্র করে এই যাত্রা পরিবেশিত হয়। এখানকার শখের যাত্রার বৈশিষ্ট্য : (১) নারীচরিত্র বাইরে থেকে ভাড়া করা হয়। (২) বাদ্যযন্ত্রীরাও বাইরের। (৩) পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালার ক্ষেত্রে পোশাক ভাড়া করা হয়। ও (৪) চরিত্রগুলির কুশীলবদের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকে।

খ) পেশাদারি যাত্রা :

উৎকর্ষের বিচারে নিচুমানের হলেও এই এলাকায় কয়েকটি পেশাদারি যাত্রাদল আছে। আদিবাসী যাত্রাও এর আওতায় পড়ে। গ্রাম্য মেলা, কোনও ধর্মীয় উৎসব বা নিছক যাত্রানুষ্ঠানেও এই দলগুলি ডাক পায়। এই ধারার যাত্রার বৈশিষ্ট্য : (১) নারীচরিত্র ভাড়া করা হয় না। (২) নিজস্ব সংগতকার থাকে। (৩) অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের প্রত্যেকেই যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। নির্দিষ্ট নাট্যবিষয়ের পাশাপাশি চটুল নাচ-গান পরিবেশিত হয়। (৫) বেশভূষার শৈথিল্য থাকে। (৬) অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংলাপ থাকে না।

এই এলাকার গীতাঞ্জলি যাত্রা সংস্থা, নবরঞ্জন নাট্যসংস্থা, রঙ্গম গোষ্ঠী পেশাদারি যাত্রা পরিবেশন করে। নিমাই মহলদার পরিচালিত নবরঞ্জন নাট্যসংস্থা 'রাজা হরিশচন্দ্র' 'মুর্শিদাবাদের নবাব' প্রভৃতি পালা পরিবশেন করে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে।

১০) অন্যান্য ধারার লোকগান ও পালাগান :

পুরাতন মালদহে ভাজোইগীতি, ঠিকরিকুটার গীতি, সান্‌ঝাগীতি প্রচলিত আছে। বামনগোলায় জিতাষ্টমীর গান, হোলিগীত, ছুটগীত, বোলাইগীতি, হবিবপুরে আলইগীতি ও গাজোলে গোয়াল-লাঠি খেলাগীতি প্রচলিত আছে। লুপ্তপ্রায় এইসব লোকগান সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হলে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির জলবায়ুতে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

এই ধারার কয়েকটি লুপ্তপ্রায় গান :

ক) ভাজোই গীতি (মহাদেবপুর, পুরাতন মালদহ)

"ভাজোইদিদি শুনো না তোমার কাণ্ডকারখানা,
বলবো কী বলিতে মন করে না,
গিয়াছিনু জমিতে জমি চষিতে
রোদে তাপে পাও চলে না।
এই ঘোর কলিকালে গেল দেশ রসাতলে
এই অনাবৃষ্টির ফলে,
বলবো কী বলিতে মন করে না।
ভাজোইদিদি শুনো না তোমার কাণ্ডকারখানা ॥"[৮]

খ) ঠিকরিকুটার গীতি (সাঞ্জাইল, পুরাতন মালদহ):

"আগা দিগার ভিটাখান ধুলধুল মাটি
তাতে বসিছে সেকারিয়া হাটি।
সেকারিয়া ভাইরে সেকা দিত ধারে
নিন্দ রাজার বেটার বিহা শনি-মঙ্গলবারে।
মা মোর জলশরী কি খলইশরী
বারে বারে মাঙছু মুই জলশরী কি জলশরী ॥"[৯]

গ) সান্‌ঝা গীতি (আইহো, পুরাতন মালদহ) :

"বারেবারে মানা করি

স্যান্‌ঝ্যা সুন্দরী টে,

না যাইও ছ ঘাটেতে স্যান্‌।

ছ ঘাটেতে আছে রে

দরবারের পোহরা রে ॥"[১০]

ঘ) জিতাষ্টমীর গীত (জামতলা, বামনগোলা) :

"খোক পেঁচা পুজিতে হামার

কিবা কিবা লাগে

সোনার চালন বাতি

ঝলবল করে রে.....।

খোক পেঁচা, খোক পেঁচা

না করিস তুই হেলা

তোক মুঁই পুজা দিম

কাইল দিপুর বেলা.....॥" [১১]

ঙ) ছুটগীত (জিগিন, গাজোল) :

"ওহে কলমু লতা,

জল শুকালে যাবেন কোথা।

তুমি নাও ঝাড়ি হাতে,

আমি নিই কলসি কাঁখে,

চল যাই বান্ধা ঘাটে।

শ্বশুরে খায় তামাক,

ভাসুরে বাড়ায় হাত,

সভার মধ্যে পণ্ডিত নাই।

বিচারে করবো কাত ॥"[১২]

চ) বোলাইগীতি (পাকুয়া, বামনগোলা) :

"মোর বুঝি আর বিহা হবি না,

তেলি পাড়ার ওই মরারা

তিয়ার বিহা দিলি ভাঙাইয়া

মোর বুঝি আর বিহা হবি না।

কত দিনের আশা গেল মোর ফুরাইয়া

মরারা আসিয়া দেলি সব কইয়া

মোর বুঝি আর বিহা হবি না,

বিধিরে, মোর বুঝি আর বিহা হবি না ॥"[১৩]

ছ) আলইগীতি (দাল্লা, হবিবপুর) :

"ও গিরি, ও গিরি,

বার করে দাও সোনার পিঁড়ি।

সোনার পিঁড়িতে বসবে কে?

বাস্তু ঠাকুর এসেছে।

বাস্তু ঠাকুর দিল বর।

বর বর বর বাস্তের বর,

ধান-চাল দিয়া গোলা ভর ॥"[১৪]

জ) গোয়াল-লাঠি খেলা গীতি (কামারডাঙা, বামনগোলা) :

"বেগুন বাড়ির ধুলধুল মাটি,

ননদ-ভাজে গলায় কাঠি।

ননদ-ভাজে কোটে ধান,

খাবার বেলা ধান বাটান। হোঃ হোঃ হোঃ

উছল কুমড়া উছল ধায়।

আমার গোয়ালা খেল দেখায়.....॥" [১৫]

লোকগান-পালাগানে টাঙন-তীরবর্তী জনপদ এতই ঋদ্ধ যে বছরের প্রত্যেকটি মাসেই শুধু লোকসুরের ঝংকার ধ্বনিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ পৃষ্ঠা-১৬৫

২. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০ পৃষ্ঠা-০২

৩. The Folk Element in Hindu culture — Binay Sarkar.

৪. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০ পৃষ্ঠা-০৩

৫. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০ পৃষ্ঠা- VI

৬. ই-টিভি বাংলা, অনুষ্ঠান 'যাচ্ছি', ০৯/০৭/২০০৫, সময় রাত - ১১.০৫

৭. মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল — সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তররঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৪

৮. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৪৬

৯. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৫১

১০. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৪১

১১. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৭২

১২. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৮১

১৩. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৮৭

১৪. সেমিনার নিবন্ধাবলী : বাংলার লৌকিক অভিকরণ শিল্পকলা ও লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্র, ফেব্রু. ২০০৮, ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোশিয়েশ্যান অব ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা-১৪২

১৫. টাঙন অববাহিকায় অর্ধশতাব্দী (প্রবন্ধ) — অতুলকুমার মণ্ডল, কামারডাঙা, পাকুয়াহাট, মালদহ। লেখকের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত।

• সূত্র-ক্রমাঙ্কহীন গানগুলি গাজোলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রুদ্রবীণা'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথকতা-কবিগান

প্রাচীন রাজন্যবর্গের অনেকেই ছিলেন ইতিহাস-বিমুখ। তাঁরা ইতিহাস-চর্চার পরিবর্তে কথকতা-কবিগানের মধ্য দিয়ে বিনোদনের রস অনুভব করতেন। রাজপ্রশস্তি গেয়ে সংসার নির্বাহ করতেন অনেক কবিই। তাই কথকতা-কবিগানের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছিল।

অন্য দিকে, নদীতীরবর্তী জনপদ হলেও, টাঙন-পারের জমি ছিল এক-ফসলি। এখানকার বেশির ভাগ এলাকায় আজও বছরে এক বার মাত্র ফসল ফলে। বর্ষার মরশুমে ধান রোপণের পর কৃষকেরা দীর্ঘ অবসর পান। তাই ভাদ্র মাসে তাঁদের অবসরযাপন। আসর বসান কথকতা ও কবিগানের ।

কথকতা :

ইতিহাসের ঘটনাবলি বংশপরম্পরায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্রোতস্বী ছিল। এইসব ঘটনাই কালক্রমে কথকতায় পরিণত হয়। তবে লোকায়ত কাহিনি ও রূপকথার কাহিনিও কথকতার খোরাক। গল্পকথক কখনও কখনও কল্পনার আলোয় রাঙিয়ে নিয়ে আত্মজীবনীমূলক কাহিনিও পরিবেশন করেন। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বরচিত কথা ও সুরে গানও পরিবেশন করেন কোনও কোনও কথক।

পাড়াগাঁয়ের শ্রোতারা এইসব কথন মন্ত্রমুগ্ধের মতো গেলেন। একটি গল্পেই কয়েক রাত পেরিয়ে যায়। কাহিনির বাঁধন ও পরিশেনার চমৎকারিত্বে এই গল্পগুলি এখনকার অনেক মেগাসিরিয়ালকেও হার মানাবে। শ্রোতারা চোখের সামনে উটি, কোবালম, জুহু বা সুইজারল্যান্ডের দৃশ্য দেখতে না পেলেও গল্পের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট যেন তাঁদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

লণ্ঠনের আলোতেই এই অনুষ্ঠান চলে। বাড়িতে আসর বসলে কথকের জন্য ভালো খাবারের বন্দোবস্ত হয়। চিতাই পিঠে, আসকা পিঠে, তালপিঠে, তালবড়া আর দুধ-খেজুরগুড় দিয়ে বানানো পায়েস। সামর্থ্য থাকলে হাঁসের মাংস।

আয়োজক-বাড়ির চাঁদোয়ার নীচে গল্পকথন শুনতে জড়ো হন ছোটো-বড় সবাই। গৃহবধূরাও রাত জেগে গল্প শোনেন। তাঁরা আবার সন্তানদের কাছে এইসব গল্প শোনান।

কথকতার মধ্যে বাণিজ্যতরী, সওদাগর প্রভৃতি প্রসঙ্গ উঠে আসে। টাঙন নদীর উপর দিয়ে একসময় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এ বিষয়ও ফুটে ওঠে কথনের মধ্য দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই এইসব কাহিনি অতিকথনে ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু উপস্থাপনার গুণে তা অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

পরাক্রমশালী রাজাদের বীরত্ব, যুদ্ধজয় আর রাজবাড়ির গোপন কিস্‌সা এইসব কথনের সিংহভাগ দখল করে আছে। শ্রোতারাও রাজবাড়ির হাঁড়ির

খবর শুনতে পছন্দ করেন। ইতিহাসের আণুবীক্ষণিক সূত্রকে হাতিয়ার করে গল্পকথকেরা কল্পলোকে নিয়ে যান চরিত্রগুলিকে। আর তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন শ্রোতৃবৃন্দ।

বাড়ির কর্তা মাছের মুড়োটা খাবেন— এটাই সংস্কার। এক রাজপরিবারের রানি তাঁর প্রণয়ীকে গোপনে মাছের মুড়ো খাওয়ান। খাওয়ার পরে রাজবাড়ির গোপন ঘরে বা সিন্দুকে গোপনে বন্দি করে রাখতেন প্রণয়ীকে। পরে রাজার পাতে ঝোলে-চুবানো ওই মুড়োটিই দিতেন রানি। এর প্রেক্ষিতে গল্প কথকেরা বলে থাকেন—

"রাজামশাই ভালই ছিল,
মাছটি খেয়ে জাতটি গেল।"

এই অণু-ছড়াটি গ্রামাঞ্চলে অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নানা ধরনের গল্পের প্লট কথকদের মুখে ঘোরাফেরা করে। টাঙন-তীরের গ্রামের সাধারণ ছেলে রাজপরিবারের সান্নিধ্যে এসে বড় হয়ে রাজসিংহাসনে বসেন। হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে কথন-কলেবর বাড়ানো হয়। অনেক সময় বিখ্যাত (কুখ্যাত) চোর বা ডাকাতের কাহিনি শোনান কথকেরা। এইসব এলাকায় ডাকাতেরা নিয়ম-মেনে কালীপুজো করে ডাকাতি করত গৃহস্থের বাড়িতে। নারীদের তারা অসম্মান করত না। কোনও ডাকাত এই রীতি-বিরোধী আচরণ করলে দলের কাছে কঠোর শাস্তি পেত। এমন-কী মৃত্যুদণ্ডও হত। ডাকাতির সময় গৃহস্থের বাড়ির তুলসীতলায় ধূপচি জ্বালিয়ে রাখত ডাকাতেরা। কিন্তু বাড়ির কেউ যদি ওই ধূপচিতে লাথি মেরে ভেঙে

ফেলতেন তবে ডাকাতেরা লুঠতরাজ বন্ধ রেখে বেরিয়ে আসত। কোনও প্রতিবাদ করা চলত না। অনেক ক্ষেত্রে অসহায় ও দরিদ্র গৃহস্থকে ডাকাতেরা তাদের অন্যত্র লুঠ করা সম্পদ দিয়ে যেত।

টাঙন-তীরের বিখ্যাত কথকতা চোর-চক্রবর্তী। নানা জায়গায় গৃহস্থের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করে এই চোর। কথকেরা বলেন, রাসবিহারী বসু যেমন পুলিশের জালে ধরা পড়েনি, তেমনই চোর-চক্রবর্তী ধরা পড়ে না।

নাগকন্যা, রাক্ষস-খোক্ষস, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি গল্পও কথনের কাঠামো পেয়েছে। নাগকন্যা কাহিনিতে নাগিনী রানি ঘুমের ঘোরে রাজাকে দংশন করতে যান। রাজপুত্র পালঙ্কের নীচে থেকে লক্ষ করেন, রানির নাক দিয়ে সাপ বেরিয়ে আসছে। রাজপুত্র তরবারির কোপে সাপকে কেটে ফেলেন। রানির স্তনে রক্ত লেগে যায়। রাজপুত্র জিভে কাপড় বেঁধে ওই রক্ত মুছে দিতে গেলে রানি জেগে যান। রানির চিৎকারে রাজা বিষয়টি বিবেচনা না-করেই পুত্রকে বনবাসে পাঠান।

রাক্ষসের মৃত্যুরহস্য জেনে রাজকন্যা উদ্ধার এখানকার একটি জনপ্রিয় কথন। পক্ষীরাজ-ঘোড়া রাজকন্যার খোঁজে আকাশ দিয়ে ওড়েন, শিকারে গিয়ে পথ-হারানো রাজপুত্র পরির দেখা পান, রাজপুত্তুর কখনও ঘোড়ায় চেপে তেপান্তরের মাঠ পেরোন, কখনও রাজকন্যাকে চুরি করে পাহাড়ের গুহায় কিংবা ঘন অরণ্যে লুকিয়ে থাকেন- এসব কল্পকাহিনি এখানকার কথকদের মুখে মুখে ঘোরে।

আইহোর রমেশ হালদারের বাড়িতে নিয়মিত কথকতার আসর বসত। মদনাবতীর বৃদ্ধ যামিনী বর্মন এখনও 'মাধবকুমার', 'সীতাহরণ', 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ', 'তাজ্জব মূল্য', 'উলঙ্গ বাহার' প্রভৃতি কথন শুনিয়ে রাতের পর রাত পার করে দেন। তাঁর 'মাধবকুমার' কাহিনির সঙ্গীতময় সংলাপের একটি অংশ—

"মাধব : শোনো সুন্দরী, যাচ্ছ কোথায়?
সুন্দরী : আমি যাচ্ছি বনফুল তুলতে—
তোমার চরণ সেবিতে।"[১]

বারো মাইলের জয়দেব বর্মন স্বরচিত কথন পরিবেশন করেন। নালাগোলার ফণিভূষণ চক্রবর্তী ও মণীন্দ্রনাথ সরকার কথকতা পরিবেশন করে অনেকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। গ্রামের অনেকেরই অনেক রাত মণিবাবুর গল্পের সান্নিধ্যে কেটেছে। পঞ্চান্ন বছর ধরে তিনি গল্পকথনের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছেন। তাঁর 'বউয়ের গুণের কথা' কথন-সঙ্গীতটি গ্রামের সবার মুখে মুখে ঘোরে। তাঁর "মুণ্ডুকাটা কালী আছে বাবা দেউড়িয়াতে"[২] অন্যতম জনপ্রিয় কথনসঙ্গীত।

কথনশিল্পীদের অবশ্য একটাই প্রত্যাশা— গল্প বলার রাত ফিরে আসুক। টিভি-সিনেমার অনেক গল্পই স্বাভাবিক রুচির পরিপন্থী। কিন্তু কথক-পরিবেশিত গল্প শ্রোতাদের ভাবতে শেখায় বলে তাঁদের দাবি। লুপ্তপ্রায় এই কথনশিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা এখানকার কথনশিল্পীদের চোখে-মুখে। লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মঞ্চে এঁদের আহ্বান করা হয় না।

কবিগান :

কথকতার পাশাপাশি কবিগানের চর্চাও টাঙন-তীরে অপ্রতুল নয়। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার উপর ভর করে উপস্থিত বুদ্ধিচাতুর্যের সহায়তায় বাংলা জুড়ে খ্যাতি বিস্তার করেছেন এখানকার কয়েকজন কবিয়াল।

এক সময় পৃষ্ঠপোষকদের সৌজন্যে কবিগানের আসর বসত। এলাকার জমিদার ও প্রভাবশালী ধনীরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পুজোপার্বণ বা সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে কবিগানের চল ছিল। বিশ শতকের শুরু থেকে এই গান সর্বজনীন আসর পেতে থাকে। এখন পৃষ্ঠপোষকদের অভাব। বেশির ভাগ সর্বজনীন অনুষ্ঠানে কবিগান ব্রাত্য।

আগে দুটি দলে উপস্থিত বুদ্ধির প্রতিযোগিতা চলত। তাৎক্ষণিক সঙ্গীতসৃজন করে একই সঙ্গে পরিবেশন করা হত। খালি গলায় পরিবেশিত এই গান শুনতে অজস্র শ্রোতা ভিড় করতেন। অ-মাইক পরিবেশনার জন্য সুর বাঁধা থাকত উচ্চগ্রামে। উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক এই গানে ঢোলকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সঙ্গে কাঁসর বাজে অনাদত্ত আওয়াজে।

আজকাল একই দলে দুজন তরজা-গায়ক অর্থাৎ কবিয়াল থাকেন। তাঁরাই দুটি দলে বিভাজিত হয়ে কবিগান পরিবেশন করেন। ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতো কবির লড়াই এখন আর নেই। অনেক ক্ষেত্রে ঢোল না-বাজলে বোঝাই যায় না যে কবিগান চলছে।

কবিগান প্রসঙ্গে গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ বলেন, "কবিগান যেন ইক্ষুদণ্ড বিশেষ। কঠিন আবরণের মাঝে সুমিষ্ট রসের অবস্থান।"[৩] গদ্যভাবাপন্ন কবিগানকে রসোত্তীর্ণ করে তোলেন দোহারেরা। তবে একসময় কবিগানে পৌরাণিক আখ্যানের সীমা ছাড়িয়ে অমার্জিত ও অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি পরিবেশিত হতো। 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তরে একদলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের ওপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময় যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সে-ই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত"।[৪]

টাঙন-তীরবর্তী অঞ্চলের কবিয়ালেরা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। গাজোলের রানিগঞ্জের হারানচন্দ্র দাস, পুরাতন মালদহের সাহাপুরের হরেন্দ্রনাথ সরকার, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর প্রহ্লাদচন্দ্র সিংহ ও ঝড়ু সরকার, হবিবপুরের শোলাভাঙা গ্রামের ভাদু সরকার, গাজোলের কাটিকান্দর গ্রামের মদনমোহন মজুমদার প্রমুখ বিখ্যাত কবিয়াল। এঁদের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন।

গাজোলের চাকনগর এলাকার অমূল্য হালদার (সরকার) একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। তিনি অনেকটা ঈশ্বর গুপ্তের মতো ভাবনা নিয়ে কবিগানের

আঙ্গিককে বাঁচিয়ে রাখার সাংগঠনিক চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। জেলায় তো বটেই, জেলার বাইরে, এমন-কী রাজ্যের বাইরেও কবিগান পরিবেশন করেছেন তিনি। কৃষিকাজের পাশাপাশি কবিগানেও তিনি সন্তোষজনক উপার্জন করেন। তাঁর গানে সাধারণত রাজনীতির বিষয় থাকে না। কিছু বিষয় তাঁরা আগাম মহড়া দিয়ে রাখেন। বাকিটা মঞ্চে তাৎক্ষণিক ভাবে উপস্থাপন করেন। আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমসাময়িক অরাজনৈতিক বিষয় তাঁর গানে কলেবর লাভ করে। তাঁর মতে, "শুধু বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে কবিগানের অস্তিত্বই লুপ্ত হতে বসেছে।"[৫] তাঁর লেখা একটি আধ্যাত্মিক বিষয়ক গানের সংক্ষিপ্ত রূপ —

"চুল দাড়ি রাখলে যদি হরি মেলে, ছাগ না রহিত দেশে;
সাধনে তৎপর নাহি অবসর, দাড়ি রাখে বিনা হুঁশে।
নিষ্কাম হলে যদি হরি মেলে বলদ না রহিত ভবে,
কামে হয়ে কামী তবে হবে নিষ্কামী সেই সে যে-ধামে যাবে।
মোটামালা গলে তিলক কাটিলে যদি হরি পাওয়া যায় —
গৌরাঙ্গলীলায় তিলকমালা পেয়েছিল গর্দভকায়।
বিচার করিয়ে দেখনা শরীরে সেই সে যে কাজ চাবে,
সেই যে গাধা ভেকাশ্রিত সেই যাবে কি ব্রজে?
নামটি আমার অমূল্য সরকার মালদা জেলায় বাড়ি —
দেশ বিদেশে করে থাকি কবির লড়ালড়ি।"[৬]

গাজোলের শংকরপুর গ্রামের অনন্ত মালাকার আর এক প্রখ্যাত কবিয়াল। তিনিও পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন। প্রথমে পাল্লাদার হিসাবে তিনি অমূল্য হালদার, শরৎচন্দ্র সরকার, জগদীশচন্দ্র সরকার ও সহদেব সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি কবিগান পরিবেশন করেন। সিপাহি বিদ্রোহের দেড় শো বছর পূর্তিতে তিনি একটি দীর্ঘ গান রচনা করে প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর লেখা একটি গানের তৃতীয় অন্তরা —

"বড় বড় মার্চেন্ট দিয়ে ধর্মের সুড়সুড়ি
অল্পদিনে কাজ বাগিয়ে করে নিলো বাড়ি-গাড়ি।
এক কোম্পানি যায় এক পথে আমরা চলি কোনও মতে
সনাতন ধর্ম জগতে পড়ছে তায় জলাঞ্জলি।"[৭]

কাটিকান্দর গ্রামের মদনমোহন মজুমদার রাজ্যের বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অসমের বিভিন্ন জায়গায় কবিগান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন। গানের কথায় বিভিন্ন বিষয়কে তিনি ব্যবহার করেন। তাঁর একটি গানের দ্বিতীয় অন্তরা—

"দয়াল তোমার দয়ায় পাইয়া সাধন মানবতরীকল
বিনা বন্ডে পরের ল্যান্ডে জনম ভরে দিলাম জল।
লেগে কাম-কামনার জলের ছোঁয়া
তরীকল মোর গেছে খোয়া।"[৮]

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের দাপটে ও সংক্ষণের অভাবে এই জনপদের কবিগানের চল ক্রমশ মিইয়ে যাচ্ছে। লোকায়ত এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা দরকার। এ জন্য স্থানীয় সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষক-গবেষকদের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগকেও আরও শক্তিশালী করতে হবে। নইলে যুগের হাওয়ায় কবিগানের ধারা লুপ্ত হতে হতে চিরসুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. যামিনী বর্মন, মদনাবতী, নালাগোলা, মালদহ-এর কাছে শ্রুত, ০২/০২/২০০৪

২. মণীন্দ্রনাথ সরকার, নালাগোলা, মালদহ-এর কাছে শ্রুত, ০৩/০২/২০০৪

৩. একালের ধৃতি (কবিগান) ৪র্থ সংখ্যা. জানুয়ারি ২০০৫, সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা: কল্যাণগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা পৃষ্ঠা-০৫

৪. রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, জানুয়ারি ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯ পৃষ্ঠা-৩৭

৫. অমূল্য হালদার (সরকার), চাকনগর, গাজোল, মালদহ-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ ০৮/১০/২০০৮

৬. কবির কাছ থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি

৭. একালের ধৃতি (কবিগান) ৪র্থ সংখ্যা. জানুয়ারি ২০০৫, সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা: কল্যাণগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা পৃষ্ঠা-৯০

৮. একালের ধৃতি (কবিগান) ৪র্থ সংখ্যা. জানুয়ারি ২০০৫, সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা: কল্যাণগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা পৃষ্ঠা-৮৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরাকীর্তি

কিংবদন্তীতে আচ্ছন্ন মালদহের প্রাচীন ইতিহাস অস্পষ্ট। অনেকের মতে, কালিন্দ্রী ও মহানন্দার মিলনস্থলে অবস্থিত একসময়ের মলদ রাজ্য থেকে মালদহ নামের উৎপত্তি।[১] চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিস এই এলাকাকে মালেন্দা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তে মালদহ নামটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।[৩] সেটি সম্ভবত আজকের পুরাতন মালদহ। কাগজে-কলমে মালদহ জেলা সৃষ্ট হয় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে।[৪] তার আগে এই জেলার উত্তর অংশ পুর্নিয়া ও দিনাজপুরের অধীনে এবং দক্ষিণ অংশ রাজশাহি জেলার অধীনে ছিল। দেশবিভাগের সময় মালদহ জেলা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী মালদহ জেলা দ্বিখণ্ডিত হয়। ১৫টি থানার মধ্যে শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ চলে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে এবং বাকি দশটি থানা ইংরেজবাজার, মালদহ কালিয়াচক, মানিকচক, গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা, হরিশচন্দ্রপুর, খরবা ও রতুয়া এ দেশের মালদহ জেলাতেই থেকে যায়। পরে কালিয়াচক ভেঙে জেলার একাদশ থানা বৈষ্ণবনগর তৈরি হয়েছে। টাঙন-তীরবর্তী বরিন্দের গাজোল কার্যত উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার।

মহাভারতের পুণ্ড্র রাজ্যের সীমা প্রসঙ্গে মহানন্দা নদীর উল্লেখ আছে। কাজেই বর্তমান মালদহ জেলার খানিকটা পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীন রাজধানী-নগর পুণ্ড্রবর্ধন পরে পাণ্ডুয়ায় পরিণত হয়।[৫] রাজা অশোকের ভাই বীতশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। এখানে থাকার সময় পাণ্ডুয়ার এক গোয়ালা তাঁকে জৈন ভেবে হত্যা করেন। গুপ্ত বংশের পৈতৃক ভিটা ছিল এই জেলায়। গৌড়ের প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের রাজত্বে মালদহ ছিল তাঁরই বিচরণক্ষেত্র। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'-তে মালদহ জেলার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় মেলে।[৬]

মালদহের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় পাল রাজত্ব থেকে। সেন যুগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ছিল মালদহ জেলাতেই। কুতুবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি মহম্মদ বখতিয়ার খলজি গৌড়ের লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড়-নগরী দখল করে তার নাম রাখেন 'জন্নতাবাদ' অর্থাৎ স্বর্গীয় নগর। শের শাহের প্রধান কর্মচারী তাজউদ্দিনের ভাই সুলাইমান কররানি অস্বাস্থ্যকর গৌড় ত্যাগ করে টাঁড়ায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় অজস্র দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেন। মালদহের টাঁড়া থেকে রাজমহলে রাজধানী সরিয়ে নেন মানসিংহ। ওলন্দাজদের পর ইংরেজরা ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে মালদহে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে।[৭] মুসলিম-পূর্ববর্তী যুগের মালদহের বেশির ভাগ পুরাকীর্তিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিছু পুরাবস্তু মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। মালদহ জেলার পুরাকীর্তিগুলি মূলত গৌড়, পাণ্ডুয়া, ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদহকেন্দ্রিক।

মালদহ জেলা থেকে এ যাবৎ তিনটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরমধ্যে দুটি টাঙন-তীরবর্তী এলাকা থেকে। প্রথমটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে খালিমপুর থেকে মিলেছে। এটির প্রবর্তক ছিলেন ধর্মপালদেব। দ্বিতীয়টি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর গাজোলের জাজিলপাড়া গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মন। তাম্রলিপিটি রাজা দ্বিতীয় গোপালদেবের। এটি 'বর্মনলিপি' নামে পরিচিত। মালদহ মিউজিয়ামে লিপিটি সংরক্ষিত আছে।

১৯৮৭-এর ১৩ মার্চ হবিবপুরের জগজ্জীবনপুরের নিকটবর্তী তুলাভিটা থেকে তৃতীয় তাম্রশাসনটি পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় যুবক জগদীশচন্দ্র গাইন এই তাম্রফলকটির আবিষ্কর্তা। ফলকটির একদিকে ৪০টি পংক্তি ও অন্যদিকে ৩২টি পংক্তি খোদাই করা আছে। সংস্কৃত ভাষায় নবম শতাব্দীর সিদ্ধমাতৃকা লিপিতে এই ফলকটি লেখা হয়েছে। নতুন রাজা মহেন্দ্রপালদেবের নাম এই প্রথম পাওয়া গেল। পাল বংশের ইতিহাসে চতুর্থ রাজা হিসেবে তাঁর নাম সংযোজিত হল। ১৯৯২ থেকে সেখানে উৎখননের কাজ শুরু হয়েছে। জগজ্জীবনপুরে পাঁচটি মুখ্য প্রত্নস্থলের সন্ধান মিলেছে। এগুলি হল : তুলাভিটা, আখরিডাঙা, নিমডাঙা, মাইভিটা ও লক্ষ্মীটিবি। এই সব এলাকায় উৎখনন করে ব্রোঞ্জনির্মিত মারীচী মূর্তি, পোড়ামাটির সিলমোহর, পোড়ামাটির ফলক, নকশাযুক্ত ইট, মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। নবম শতাব্দীর একটি বর্গাকার বৌদ্ধবিহার এখানে উন্মোচিত হয়েছে।

টাঙন-তীরের পুরাকীর্তির অন্যতম খনি গাজোল। এখানকার আদিনা, পাণ্ডুয়া, রানিগড়, দেওতলা, টুঙ্গিশহর প্রভৃতি এলাকার পুরাকীর্তি পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

১) বড় দরগা :

গাজোল থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে ৮ কিমি গেলে ডান ধারে পড়ে বড় দরগা। মূল দরগা ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। জামি মসজিদ, ভাণ্ডারখানা, লক্ষ্মণসেনী দালান, তানুরখানা বা তন্দুরখানা, চাঁদ খাঁর সমাধি, হাজি ইব্রাহিমের সমাধি, চিল্লাখানা ও প্রাচীন এক পুকুর নিয়ে বড় দরগা। এই দরগা হজরত শাহ জালালউদ্দিন তাব্রিজির স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত। মূল দরগাটির নির্মাতা সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ। পাণ্ডুয়ার প্রধান হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করে দরবেশ তাব্রিজির নির্দেশে এটি বানানো হয় বলে অনুমান।[৮] দরগায় বহু হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন আজও অক্ষত হয়ে আছে। হিজরি রজব মাসের ২২ তারিখ থেকে এখানে এক সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। অগণিত মানুষ মেলায় আসেন। এই মেলা এখন 'পাণ্ডুয়া-মেলা' নামে বিখ্যাত।

২) আসনশাহি ও সালামি দরওয়াজা :

বড় দরগা দেখার পর পিচরাস্তা ধরে গ্রামের দিকে এগোলে রাস্তার ধারে পড়ে সালামি দরওয়াজা। এটি বড় দরগার অংশ বিশেষ। ইটের তৈরি এই

প্রবেশদ্বারটি ২২ ফুট লম্বা ও ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। এরই পাশে আছে খুব উঁচু বেদি - আসনশাহি। বলা হয়, দরবেশ এই বেদিতে বসে উপাসনা করতেন।

৩) ছোট দরগা :

এই দরগার অন্য নাম ছয় হাজারি দরগা। সুবাদার শাহ সুজা এই দরগাকে ছয় হাজার বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। আজও এর পিরোত্তর সম্পত্তি অক্ষত আছে। এখানে আছে পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ হজরত নুর কুতবুল আলম বা কুতুব-ই-আলমের সমাধি। কুতুবুল রাজা গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন। ১৪২৭ সালে এটি নির্মিত।

৪) কুতুবশাহি মসজিদ :

ছোট দরগা থেকে খানিকটা এগিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে পির কুতুবুল আলমের সমাধি ও একলাখি ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে এই কুতুবশাহি সমজিদ, যার অন্য নাম সোনা মসজিদ। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি বানানো হয়। এর শীর্ষের গম্বুজগুলির চূড়াসমূহ সবুজ রঙের মিনা করা টালিতে ঢাকা ছিল। তাই এর নাম সোনা মসজিদ। এখন মিনা করা টালি ও গম্বুজ নেই।

৫) একলাখি সমাধি ভবন :

সোনা মসজিদের ১০০ মিটার উত্তর-পূর্বে একলাখি সমাধি ভবন রাস্তার বাম ধারেই। আটকোনা বুরুজবিশিষ্ট এক গম্বুজওয়ালা সমাধি ভবনটি ১৪১২-

১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। নির্মাণ-ব্যয় ছিল এক লক্ষ মুদ্রা। তাই এর নাম একলাখি ভবন। ভেতরে তিনটি সমাধি। এগুলি রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র যদু বা জালালউদ্দিন, তাঁর মুসলমান স্ত্রী ও পুত্রের। রাজা গণেশ এই ভবনের নির্মাতা। পাণ্ডুয়ার সেরা প্রত্ন-নিদর্শন এই একলাখি ভবন । এর টেরাকোটা কাজ দর্শনার্থীদের আজও মন্ত্রমুগ্ধ করে। ভবনটির আয়তন বর্গাকার। চারদিকেই দরজা আছে।

৬) আদিনা মসজিদ :

গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া পিচরাস্তা ধরে একলাখি থেকে এক কিমি এগোলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগ স্থলে প্রাচীন আদিনা মসজিদের অবস্থান। আদিনা মসজিদ বাংলার গৌরব। সুবিশাল এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ ভ্রমণার্থীদের আজও বিস্ময়াবিভূত করে। ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। সময় লাগে দশ বছর। এর নির্মাতা সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কিংবা বৌদ্ধবিহারের অবশেষের উপর এই মসজিদ নির্মিত।[৯] এখানে ব্যবহৃত ইট, টেরাকোটা, পাথর ইত্যাদির অধিকাংশ হিন্দু মন্দির ভেঙে জোগাড় করা হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে আদিনা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ। প্রার্থনাকক্ষটি আকর্ষণীয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল মূলকক্ষ। সামনের খিলান, ভল্টযুক্ত খিলান ও অলঙ্কৃত 'প্যাবাপেট' আজ আর নেই। এখানে পদ্মের মোটিফ, ঝুলন্ত লম্বা কারু-কার্যের মোটিফ, ঝুলন্ত শৃঙ্খল-প্রদীপ, জীবনবৃক্ষ, নাগদণ্ড, হংসতোরণ দর্শনীয়। উপসনাকারীদের ডানদিকে

একটি বেদি আছে। এখান থেকে ইমাম নমাজ পরিচালনা করতেন। কালো পাথরের তৈরি বেদিটি রাজ-সিংহাসনের আদলে বানানো।

• আদিনা মৃগদাব :

আদিনা মসজিদের সামনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পূর্বে আদিনা বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে পিচ-ঢালা পথে দেড় থেকে দুই কিমি গেলে মৃগদাব দেখা যায়। রাজ্য বন বিভাগের অধীনস্থ এই অরণ্যে হরিণ ছাড়াও বিভিন্ন পাখি ও জীবজন্তু আছে। পরিযায়ী পাখিরাও এখানে আসে। আরণ্যক পরিবেশে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। বনজ জলাশয়ে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণ করা হয়। পৌষ মাসে চড়ুইভাতির জন্য এখানে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আসেন।

৭) টুঙ্গি শহর :

গাজোল থেকে ২০-মাইল হয়ে হরিরামপুরগামী পথে এগোলে উত্তর-পশ্চিমে তাহেরখানি গ্রাম। সেখানে অবস্থিত টুঙ্গি শহর। বেশ উঁচুতে অবস্থিত টিলার জন্য টুঙ্গি শহর নাম হয়ে আছে। স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক হোপনা মার্ডি বাড়ি তৈরির পুরনো ভিত নির্মাণ করতে গিয়ে একটি বেদি আবিষ্কার করেন। এই বেদিতেই তাঁর পারিবারিক কালীপুজো হয়। একটি বিশাল মন্দিরে অলঙ্কৃত ও পার্শ্বদেব-খচিত পাথরের চৌকাঠ এখনও টুঙ্গি শহরের মাটিতে পড়ে আছে। লালমাটির নিচে থেকে উঁকি মারছে ইটের ভাঙা দেয়াল ও পশুমূর্তি। সংস্কারের সময় ১৯৭৭-এ বেরিয়ে এসেছিল হিন্দু আমলের কয়েকটি দেবদেবী ও

পশুমূর্তি। পাথরের দেবদেবীর ভাঙা হাত-পায়ের অংশ ও অজস্র খোলামকুচি এই এলাকায় ছড়িয়ে আছে।

৮) রাইখানদিঘি :

একলাখি স্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণ এলাকায় একটি বিশাল দিঘি দেখা যায়, এর নাম রাইখানদিঘি। কুষাণ যুগ থেকে মুসলিম আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের পুরারত্নসমৃদ্ধ লালমাটির প্রশস্ত পাড়যুক্ত এই দিঘি। শশাঙ্কের আমলে কর্ণসুবর্ণ থেকে যে-ধরনের ইট পাওয়া গেছে, সে ধরনের ইটে গাঁথা দেওয়াল রাইখানদিঘির পাড় থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। এগারো শতকের টেরাকোটা ফুলদানি, পোড়ামাটির গুলতির গুলি ও খেলনা, পাথরের থালা, স্বর্ণ-আভাযুক্ত খোলামকুচি প্রভৃতির সন্ধান মিলেছে এই দিঘি থেকে। জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সঙ্গে এগুলির মিল আছে। একটি খেলনা পুতুলের দিঘল নয়ন, শিরালরেখায় চিহ্নিত কেশবিন্যাস মিশরীয় বালিকার মতো অপূর্ব সুন্দর। মিনা করা তৈজসপত্রের ভগ্নাংশ মুসলিম আমলের সাক্ষ্য। দিঘির উত্তরে যে-দুটি ঢিবি আছে তা ধনা-মনার ঢিবি নামে পরিচিত।

হরিদাস পালিতের মতে, রাইখানদিঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি বড় মাপের মন্দির ছিল। বুদ্ধদেব ধর্মোপদেশ দিতে রাইখানদিঘিতে একবার এসেছিলেন। আর সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ তৈরি করে দিয়েছিলেন। স্থানীয় গবেষক শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরি এ মত সমর্থন করেছেন। প্রত্নবিদ সরসীকুমার সরস্বতী রাইখানদিঘি এলাকাকে সম্ভাবনাপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র বলেছেন।[১০]

৯) রানিগঞ্জের রানিগড় :

রানিগঞ্জ বাজারের খানিকটা দক্ষিণে রানিগড়ের অবস্থান। টাঙনের পরিত্যক্ত খাতের উপর ইট, পাথর, চুন ও সুড়কিতে নির্মিত বিশাল সেতুর ভগ্নাবশেষ এখানে দেখা যায়। পূর্ব দিকে টাঙন মূলখাতে প্রবাহিত হয়েছে। এস কে সরস্বতীর ভ্রমণ পুস্তিকায় রানিগড়ের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়েছে। পাথরের চামুণ্ডামূর্তি, ফ্লোরাল ডিজাইনযুক্ত প্রস্তরফলক, প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের কারুকার্য খচিত চৌকাঠ, বিভিন্ন মূর্তির ভগ্নাংশ দেখা যায়। রানিগড়ের সেতুর সঙ্গে যুক্ত সড়কটি পূর্ব দিকে বাংলাদেশের নাটোর ও দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে গৌড়নগরীর সঙ্গে এক সময় যুক্ত ছিল।

১০) নাসির শাহের দিঘি :

পাণ্ডুয়ার বৃহত্তর এলাকায় এক সময়ে এই দিঘিটি সংরক্ষিত ছিল। দিঘিটি কোনও হিন্দু রাজার খনন করা। মুসলিম আমলে এর সংস্কার করে এমন নামকরণ করা হয়েছে।

১১) সাতাশঘরা দিঘি :

আদিনার দু-কিলোমিটার পূর্বে সাতাশঘরা দিঘির অস্তিত্ব মেলে। তবে সাতাশঘর বা ষাটগম্বুজ বলে এখানে একটি রাজপ্রাসাদ ছিল। প্রাসাদে একটি আটকোনা বিশিষ্ট হামাম বা স্নানাগারের ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। কানিংহাম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই স্নানাগারকে 'Turkish bath of the Palace' বলেছেন। দিল্লির অনুকরণে এই স্নানাগার তৈরি হয়েছিল। এতে দিল্লির গৌরব

খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। এজন্য ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ দিল্লি থেকে বাংলা আক্রমণ করেন।[১১]

১২) দেওতলা :

সেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজির স্মৃতিবিজড়িত একটি চিল্লাখানার জন্য দেওতলার খ্যাতি। গাজোল থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে এর অবস্থান। তাব্রিজি কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন। দেওতলার পূর্বনাম তাব্রিজাবাদ। হিন্দু আমলে এর নাম ছিল দেবস্থল। চিল্লাখানাটি কোনও দেবমন্দিরের উপরে নির্মিত হয় বলে অনেকের অনুমান। নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে কষ্টিপাথরের বেশ কিছু মূর্তি মিলেছে।

১৩) গাজোল থানাচত্বর :

গাজোল থানার কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরে বেশ কয়েকটি প্রত্নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। কালীমন্দিরে সূর্য, মনসা ও বিষ্ণুমূর্তির ভাঙা অংশ আছে। বিষ্ণুমন্দিরে কষ্টিপাথরের একটি পূর্ণাবয়ব বিষ্ণুমূর্তি নিয়মিত পূজিত হয়। এখানেই দুর্গামন্দিরে আরেকটি বিষ্ণুমূর্তি রাখা আছে। শিবমন্দিরে একটি সূর্যমূর্তি ও একটি ব্রহ্মামূর্তি ঠাঁই পেয়েছে।

১৪) হবিনগর :

গাজোলের চাকনগরের হবিনগর গ্রামের রঙমহল থেকে প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানীয় প্রমীলা হাজরা বাড়ি তৈরির সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রচুর প্রত্নবস্তুর সন্ধান পান। রাজমুকুট, তলোয়ার, ঢাল, ঘণ্টা, ফুলঝারি, সোনার থালা প্রভৃতি উঠে আসে সেখান থেকে। নানা ধরনের বৃহদাকার কৃপাণ মিলতে থাকে। এখান থেকে প্রাপ্ত সোনার পুতুল নিয়ে প্রতিবেশী গ্রাম ইমামনগরের সঙ্গে চাকনগরের সংঘর্ষ শুরু হয়। তিন মাস পুলিশ পিকেট বসে। গাজোল থানা প্রত্নবস্তু উদ্ধার করে আনে। কথিত আছে, রাজনগরের রাজার সঙ্গে পাশা খেলায় হবিনগরের রাজা হারতে হারতে শেষ পর্যন্ত রানিকে পণ ধরেন। তাতেও তিনি হেরে যান। এ কথা শুনে গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে রানি আত্মঘাতিনী হন। এজন্য এখানকার পুকুরটির নাম রানিডোবা। এক সময় মরা টাঙনের সঙ্গে এই পুকুরের সংযোগ ছিল বলে জনশ্রুতি। বাণিজ্যের জন্য নৌকো ছিল। এখন তা পচে গেছে। পুকুরটির জল শুকোয় না। পুকুর থেকে কষ্টিপাথরের অনেক দেবমূর্তি মিলেছে। বেশির ভাগই বেহাত হয়ে গিয়েছে। চড়া দামে ভিনদেশে মূর্তিগুলি পাচার হয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বদ্ধমূল ধারণা।

১৪) জগজ্জীবনপুর :

হবিবপুরের জগজ্জীবনপুর এখন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের নজরের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ এখানকার তুলাভিটায় স্থানীয় জগদীশচন্দ্র গাইনের কোদালের ডগায় ওঠে আসে একটি তাম্রশাসন। পালবংশের চতুর্থ রাজা মহেন্দ্রপালের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। তিনি দেবপাল-মাহাটার পুত্র। তাই

দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল রাজা হন, শূরপাল নন।[১২] নবম শতকের এই তাম্রশাসনটির মূল বিষয় সেনাপতি বজ্রদেবের অনুরোধে বৌদ্ধ দেবতাদের পূজা ও ভিক্ষুদের উপসনার জন্য রাজা মহেন্দ্রপালদেবের জমি দান। এই জমি নন্দদির্ঘীকা মহাবিহারের কাছাকাছি অবস্থিত। ফলকে টঙ্গিল নামে একটি নদীর উল্লেখ আছে। নন্দদির্ঘীকা- উদ্রঙ্গ মহাবিহারের পূর্ব দিকে এই নদী প্রবাহিত বলে তাম্রফলকে খোদিত আছে। অনেকে এই নদীকে টাঙন বলে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে টাঙন নদী এই মহাবিহারের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত। এখানকার বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে বিক্রমশীলা মহাবিহারের সাযুজ্য আছে। এখান থেকে ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি, পাথরের বুদ্ধমূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির সিলমোহর, নকশাযুক্ত ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ১৯৯২ থেকে খোঁড়া শুরু হলেও ১৯৯৬ থেকে বেশ জোরদারভাবে খননকার্য চলছে। তবু বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও সংলগ্ন সম্ভাব্য আরও চারটি বিভাগ এখনও সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি। মালদহ প্রত্নশালায় একটি পৃথক কক্ষে জগজ্জীবনপুর থেকে ওঠে আসা প্রত্নসামগ্রী রাখা হয়েছে।

১৫) বানপুরের ঝাপড়ি কালী :

হবিবপুরের সিঙ্গাবাদ স্টেশনের প্রায় দেড় কিমি আগে রেললাইনের ঠিক পাশেই বানপুরের ঝাপড়ি কালীমন্দির। প্রাক স্বাধীনতা আমলের এই মন্দিরে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পুজো হয়। বৈশাখ মাসে ভিন-রাজ্যের মানুষও এখানে পুজো দিতে আসেন। চৈত্রের রামনবমীতে মহাধুমধাম করে পুজো হয় ও বিরাট

মেলা বসে। মায়ের থানটিতে দেখা যায় সিঁদুরচর্চিত একটি মাটির ঢিবি। কোনও মূর্তি নেই। ঢিবিতে পুজো করা হয়। পাশে অবস্থিত রুদ্রচণ্ডীদেবীর একটি বাঁধানো বেদি। অনেক পার্শ্বদেবতাও এখানে পূজিত হন। মন্দির চত্বরের মধ্যে পড়ে থাকা প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তির ভগ্নাবশেষ ও তার পাশে পুরোনো একটি পুকুর পাড়ে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন ইট ও প্রস্ত রখণ্ড প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

১৬) আইহো শিবমন্দির :

টাঙন যেখানে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে সেই মোহানার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ আইহো। এখানে দুটি শিবমন্দির আছে। মঠের গম্ভীরার শিবমন্দিরে চারটি শিবলিঙ্গ আছে। আর একটি জীর্ণ শিবমন্দিরেও আছে চারটি শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরে কালো ব্যাসল্টের তৈরি একটি বিষ্ণুমূর্তি রাখা আছে।

১৭) <u>বুলবুলচণ্ডী</u> :

প্রায় এক শো বছর আগে এখানকার এক প্রাচীন পুকুর থেকে প্রস্ত রনির্মিত পালঙ্কে শায়িতা এক নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিটির কোলে একটি শিশু খোদিত আছে। মূর্তিটিকে লোকে চণ্ডীজ্ঞানে পুজো করতে শুরু করে। এইভাবেই বুলবুলি এলাকা পরিণত হয় বুলবুলচণ্ডীতে। বর্তমানে ওই মূর্তিটি বুলবুলচণ্ডী স্টেশন থেকে বাজারগামী রাস্তার একটি একতলা দালানে প্রতিষ্ঠিত

আছে। বৈশাখের প্রতি মঙ্গলবার অসংখ্য ভক্ত সমাগমে ধুমধাম করে পুজো হয়।

১৮) তিলাসন :

হবিবপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা তিলাসন। উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিজলবন এখানে অবস্থিত। এই হিজলবন মুখ্যত কেউটে ও গোখরো সাপের চারণভূমি। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড চিতাবাঘ শিকারে এখানে এসেছিলেন। সে সময় জমিদার ভৈরবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তিনি দেখা করে করমর্দন করেন। এডওয়ার্ডের সামনেই ভৈরবেন্দ্রবাবু গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। সম্প্রতি এখানে ভৈরবেন্দ্রবাবুর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

১৯) শিবডাঙি :

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গটি[১৩] এখানকার মন্দিরে অবস্থিত। বামনগোলার একটি যোগাযোগসংকুল গ্রাম শিবডাঙি। মালদহ জেলার প্রাচীনতম এই মন্দিরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ১' ১০" ও ব্যাস ৪' ৯"। একটি প্রাচীন বটগাছের গোড়ায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি তিলভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির নামে পরিচিত। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে জমজমাট মেলা বসে। ভাদ্র-পূর্ণিমাতেও পুজো অনুষ্ঠিত হয়। জরাজীর্ণ এই মন্দিরটির ভেতরের চারদিকে চুন-সুড়কি দিয়ে তৈরি ভুট্টার মোটিফ আছে।

২০) জগদলা :

রাজা রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল মহাবিহারটি এখানেই অবস্থিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তবে তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে। এই চত্বরে প্রচুর ইটের টুকরো ছড়িয়ে আছে। একসময় বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। বামনগোলার জামতলা থেকে দু-কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি মুসলিম-উত্তর যুগের তৈরি। রামপুকুর, শ্যামপুকুর, নলপুকুর, ঠাকুরপুকুর, চন্দ্রপুকুর প্রভৃতি নামে প্রচুর জলাশয়ের অবস্থান আছে এখানে। জগদলা থেকে প্রচুর প্রস্তর-মূর্তি মিলেছে।

২১) মদনাবতী :

বামনগোলার দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্তে মদনাবতীর অবস্থান। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা পর্বের লেখক উইলিয়াম কেরি নীলকুঠির দায়িত্ব নিয়ে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন এখানে আসেন। ছিলেন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন পর্যন্ত।[১৪] স্কুল প্রতিষ্ঠা, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির বিস্তার, চিকিৎসার প্রসার, বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেরির অবদান বংশানুক্রমে স্মরণ করেন এখানকার মানুষ। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মদনাবতীতে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য তিনি যে-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাতে দেশীয় শিক্ষা হিসেবে রামরাম বসু, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও মোহন চন্দ যুক্ত ছিলেন। এখানেই কেরি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। মদনাবতীর মেঘডুমরাদিঘির পাশে নীলকুঠি ও নীলতৈরি কারখানার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কেরিপুত্র পিটারের সমাধিস্থল আছে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাঠের তৈরি একটি বাংলা মুদ্রণযন্ত্র এখানে স্থাপনের জন্য এনেছিলেন কেরি। কিন্তু ছাপা

শুরু করতে পারেননি। পরে যন্ত্রটিকে শ্রীরামপুর মিশনে স্থাপন করেন তিনি। বহুমুখী প্রতিভাধর কেরিকে স্মরণ করে প্রতি বছর ২৬ ডিসেম্বর এখানে কেরি মেলা বসে।

২২) পুরাতন মালদহ :

প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পুরাতন মালদহের খ্যাতি। এখানকার জামি মসজিদ বিশেষ আকর্ষণীয়। শিলালিপিতে এই মসজিদকে ভারতের কাবা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আকবরের সময়ে মসজিদটি নির্মিত হয়। সংস্কার হয় হোসেন শাহের আমলে। শাহ লঙ্কাপতির সমাধি, শাহ গদার দরগা, শাকমোহন মসজিদ, ফুটি মসজিদ, কাটরা ও পারাঢালা দিঘি এখানকার দর্শনীয় স্থান।

দুটি গুরুদ্বার আছে এখানে। একটি মঙ্গলবাড়ি রেলগেটের পাশে ও অপরটি পুরাতন মালদহে। পুরাতন মালদহের গুরুদ্বারে ধর্ম প্রচারের জন্য গুরুনানক এসেছিলেন। ১৪৬৮-'৬৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে এসে তিনি সাড়ে তিন মাস অবস্থান করেন। তাঁর ব্যবহৃত তরবারি, স্নানের বালতি, মাটির কুঁজো ও কুয়ো এখনও আছে। গুরু তেগবাহাদুরও এখানে এসেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত বর্শা আছে এখানে ।

২৩) মোরগাঁ-মাধাইপুর :

বহু প্রাচীন একটি কালীমন্দির আছে। কথিত আছে, বল্লাল সেন চারটি দ্বার-অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জহুরাচণ্ডী, পাতালচণ্ডী,

দ্বারবাসিনীচণ্ডী ও মাধাইচণ্ডী। মাধাইচণ্ডীর মন্দিরের ডানদিকে ফাঁকা আকাশের নিচে চারটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের উল্টো দিকে সাতটি ঢিবিযুক্ত বাঁশুলির থান। স্থানীয়ভাবে এর নাম কাঁচা-খাকীর থান। মূল মন্দিরের ভেতরে বাঁধানো বেদির ওপর ছোট্ট উঁচু ঢিবি দেখা যায়। ওই ঢিবির উপরে কয়েকটি মুখোশ রাখা আছে। মহীপালদেবের রাজত্বের একটি বুদ্ধমূর্তি-সহ কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি এখান থেকে মিলেছে। এগুলি মালদহ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

প্রখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা ও হোসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এখানে তাঁদের মাতুলালয়ে বাস করতেন বলে গ্রামটি আরও খ্যাতি পেয়েছে। রূপ ছিলেন হোসেন শাহের প্রতিরাজ (সগির মালিক) ও সনাতন ছিলেন প্রধান মুন্সি (দবির খাস)। সম্প্রতি রূপ-সনাতনের মন্দির নির্মাণে স্থানীয় মানুষেরা উৎসাহী হয়েছেন।

এসব ছাড়াও গোয়ালজয়ের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, দেউড়িয়ার ভাঙা স্তূপ ও নরবলির স্থান, বারো মাইলের কালীমন্দির, তেঁতুলবাড়ির শিবমন্দির, পাউলের পিরের দরগা, মহাপাউলের বুরুজ, বোদরার পিরের মাজার, বামনঘাটের প্রস্তরমূর্তি, রানিপুরে প্রাচীন পাথরের মূর্তি, ইচাহারে মালদহ জেলার প্রাচীনতম দুর্গাপুজোর আয়োজক জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, গোবিন্দপুরের প্রাচীন দুর্গামণ্ডপ, নিত্যানন্দপুরের জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গামন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, তেনাপিরের তিন-সতিনের ঘাট প্রভৃতি টাঙন-

অববাহিকায় পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বহন করছে। ১৯৯৯-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি হবিবপুরের মাণ্ডালু গ্রামে এক বিশাল প্রত্নঢিবি আবিস্কৃত হয়েছে।

এখানকার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত কষ্টিপাথর ও প্রাচীন পাথরে তৈরি দেবদেবীর প্রচুর মূর্তি মালদহ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে সূর্যমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যাই বেশি। প্রজ্ঞাপারমিতা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বৌদ্ধমূর্তি ও কয়েকটি দুর্লভ মূর্তি আছে এখানে। তবে উপযুক্ত নজরদারির অভাবে এক সময় টাঙন-তীরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রচুর দুস্প্রাপ্য প্রত্নবস্তু পাচার হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে, খননের অভাবে অজস্র পুরানিদর্শন এখানকার মাটিতেই চাপা পড়ে আছে। লুকিয়ে আছে অনেক অজানা ইতিহাস। তাই এসব এলাকায় দ্রুত খনন কার্য শুরু হওয়া দরকার। ভ্রমণপিপাসুদের কথা মাথায় রেখে বরিন্দে পর্যটনক্ষেত্র গড়ে তোলাও জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-০৩

২. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-০৩

৩. জানা অজানার মালদহ — ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ, জানু. '০৬ মালদহ পৃষ্ঠা-০৮

৪. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-০১

৫. গৌড়ের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)— রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সম্পাদনা: ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ (জানুয়ারি ১৯৯৯) পৃষ্ঠা-৪২-৪৩

এবং

গাজোল গাইড — ২০০১, প্রকাশক: মৌমিতা ভার্মা, অ্যাড সেন্টার, গাজোল, মালদহ পৃষ্ঠা-০৪

৬. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-১০

৭. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-১০

৮. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-৬৫

৯. গৌড়ের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), —রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সম্পাদনা: ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ (জানুয়ারি ১৯৯৯) পৃষ্ঠা-৪৩

১০. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-৯১

১১. প্রবন্ধ: মালদা জেলার পুকুর-দিঘি-জলাশয়ের কথা — পুষ্পজিৎ রায়, গৌড় মালদা সংবাদ, শারদীয়া ১৪১০, মালদহ পৃষ্ঠা-১৫

১২. 'যুগান্তর' পত্রিকা, ১৫ মার্চ ১৯৯৪ ('মাটি খুঁড়তেই ইতিহাসের নতুন সংযোজন' শীর্ষক প্রতিবেদন— গৌরাঙ্গদেব ভার্মা)

১৩. মালদহ সমাচার, বর্ষ ১০৪, সংখ্যা ২, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ পৃষ্ঠা-০৬

১৪. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-১০২

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণ

টাঙন-তীরের বেশির ভাগ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী। বৃহত্তর বাঙালি হিন্দু সমাজের যেসব পুজো ও পালাপার্বণ আছে, সেগুলি এ অঞ্চলে পালন করতে দেখা যায়। যেমন- দুর্গাপুজো, কালীপুজো (কোজাগরি পূর্ণিমার পরের অমাবস্যা), লক্ষ্মীপুজো, বিশ্বকর্মাপুজো, গণেশপুজো, সরস্বতীপুজো ও কোথাও কোথাও বাসন্তীপুজো । তবে প্রথাগত এই পুজোপার্বণের বাইরেও সারা বছরই স্থানীয়ভাবে লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানের বহর দেখা যায়।

কালীপুজো:

এ অঞ্চলের বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এঁদের নিজস্ব পরম্পরা ও সংস্কৃতি অনুসারে বছরের বিভিন্ন সময়ে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। রাজবংশি ও পলিয়া সম্প্রদায় অঘ্রানের নবান্ন উৎসবের আগে কালীপুজো করে থাকেন। বছরের সুবিধেজনক সময়ে রাজবংশি সম্প্রদায় গ্রাম-কালীপুজো করেন। মঙ্গলসূচক কাজ করার আগে কালীপুজো সম্পন্ন করা অনেক পরিবারের একটি প্রচলিত প্রথা।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কালীপুজোর প্রচলন আছে। কালীপুজো এই অঞ্চলকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সাঁওতাল, মুন্ডা,

ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এই পুজো করেন। অনেক গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাও কালীপুজো করে থাকেন। গাজোলের দেওতলা ও গোবিন্দপুরে চিরাচরিতভাবে দেবীকালী পূজিতা হচ্ছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে। তবে দীপাবলির রাতেও রাজবংশি সম্প্রদায় 'গছা দেওয়া' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কালীপুজোয় মেতে ওঠেন। তাঁরা বাস্তুঠাকুরের থান, ঘরের দরজা ও দেবস্থানে কলাগাছ পুঁতে অধিকারীকে দিয়ে পুজো করান। সেখানে সারা রাত প্রদীপ জ্বলে। পরের দিন খুব ভোরে কলাগাছগুলিকে পুকুরে ফেলে দেন তাঁরা।

মনসাপুজো :

এ অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনসাপুজো । এই পুজোর সঙ্গে সর্পভয়ের সম্পর্ক আছে। এই এলাকার উচ্চবর্ণের হিন্দু থেকে অন্ত্যজ সম্প্রদায় সবার ঘরেই মনসা পূজিতা হন। মনসাপুজোকে কেন্দ্র করে নানা লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার ও গল্প-গাথার প্রচলন আছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সতী বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে নদীপথে ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন। সেই বেহুলা নদীর অবস্থান টাঙন নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত। টাঙন নদীর সঙ্গে বেহুলা নদী মিশেছে হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীতে। দুই নদী মিলনের ফলে মনসামঙ্গল গান ও মনসাপুজো এখানকার জনপদের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। গাজোল, হবিবপুর, পুরাতন মালদহ ও বামনগোলার বিভিন্ন গ্রামে মনসাগানের ব্যাপক প্রচলন আছে।

মঙ্গলচণ্ডীপুজো :

টাঙন তীরের অন্যতম পার্বণ মঙ্গলচণ্ডীব্রত। শুধু গ্রাম্য মহিলারই নন, শহর-ঘেঁষা জনপদের বহু পরিবারের শিক্ষিত মহিলারা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে থাকেন। গৃহবধূদের পাশাপাশি স্কুল-কলেজপড়ুয়া মেয়েরাও এই ব্রতে শামিল হন। সাধারণত বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবার উপোসি থেকে দুপুরে বা বিকেলে বা সন্ধ্যায় চণ্ডীপুজো করেন তাঁরা। মহিলারা নিজেরাই এই পুজো করেন। তবে আজকাল ব্রতকথা হিসাবে অনেকেই কালকেতু বা ধনপতি সওদাগরের কাহিনিটি গদ্যাকারে পাঠ করেন।

টাঙন-তীরের রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাপক প্রভাব আছে। একসময় এখানকার গৃহস্থ বাড়ির বার্ষিক মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান হিসাবে চণ্ডীপুজো করা হত। আজও কোনও কোনও রাজবংশি পরিবার অন্নপ্রাশন, বিয়ের মতো শুভানুষ্ঠান মঙ্গলচণ্ডীর পুজো ছাড়া ভাবতেই পারেন না। মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল এই অঞ্চলে বিশেষভাবে সমাদৃত। চণ্ডীমঙ্গলের অষ্টমঙ্গলাগানে মোট ষোলোটি পালা গাওয়া হয়।

গম্ভীরাপুজো :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের শিবের বিশেষ আরাধনা গম্ভীরা নামে পরিচিত। গম্ভীরাকে কেন্দ্র করে পুজো-উৎসব-মেলা-পার্বণের চল রাজবংশি সম্প্রদায়েরর মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই পুজোকে ঘিরে গাজন মেলা ও চড়ক

মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চড়কে সাধারণত ধানুক সম্প্রদায়ের লোকেরা পিঠে বড়শি ফুঁড়ে চড়কদণ্ডের মাথায় ঘোরেন। অত্যন্ত কষ্টকর এই অনুষ্ঠান। প্রায় একমাস ধরে ঘরোয়া পুজোপার্বণের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করেন। গম্ভীরার পুরনো আঙ্গিক হিসেবে প্রথম দিন ঘট ভরা, দ্বিতীয় দিন ছোটো তামাশা, তৃতীয় দিন বড় তামাশা, চতুর্থ দিন মশান নাচ আজও লক্ষ করা যায়। মশান নাচের সময় ঢাকের সঙ্গে কালীমুখোশ পরিহিত ভক্ত ধূপচির ধোঁয়া নিতে মেতে ওঠেন। পরে সেই ভক্ত টাঙনের জলে স্নান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটান।

অন্যান্য হিন্দুব্রত :

পলিয়া রাজবংশি চাঁই ও ধানুক সমাজের মধ্যে কোথাও কোথাও রথাই ব্রতের প্রচলন আছে। আলপনা-আঁকা একটি রথের কাছে মনস্কামনা পূরণের জন্য মহিলারা মানত করেন।

রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে চাষের জমিতে গিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে 'আকলাই নেওয়া' অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। নতুন ধান ওঠার এই হৈমন্তিক উৎসবের পরেই তাঁরা নবান্ন পালন করেন। আকলাই নেওয়ার সময় কয়েকটি ধানের শিষ কাস্তে-সহ কলার পাতায় মুড়িয়ে বাড়িতে এনে গোলাঘরে রাখা হয়। পাকুয়ার ঈশ্বরপাড়ায় নবান্নের দিন হিন্দু আচার অনুযায়ী আমগাছের নিচে গ্রামের লোকেরা পুজো করেন। একই সঙ্গে তাঁরা পিরের থানে শিন্নি উৎসর্গ করেন।

বেশি ফসলের আশায় ও অপদেবতার প্রকোপ থেকে শস্যকে রক্ষা করতে রাজবংশি সম্প্রদায়ের লোকেরা 'লখিডাক' অনুষ্ঠান পালন করেন। আশ্বিনের সংক্রান্তির সন্ধ্যায় তাঁরা পাটকাঠি জ্বালিয়ে চাষের ক্ষেতে ঘোরেন আর ছড়ার মতো করে আগুনের কাছে বেশি ফসল পাওয়ার কামনা করেন।

চাঁই সমাজের মধ্যে আশ্বিন মাসে জিতাষ্টমী ব্রত, হোলির দিন ডোরাবাঁধা অনুষ্ঠান, কার্তিক মাসের কালীপুজোয় উল্কা উৎসব, পৌষসংক্রান্তিতে সোনারায়ের পুজো, দোলপূর্ণিমার ভোরে আগজি পুজো, অঘ্রান মাসে জঙ্গলথাসা অনুষ্ঠান দেখা যায়। তবে এই জনপদের চাঁই সমাজের মধ্যে পাঁচ পিরকে বাস্তুদেবতা হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[১] বৈশাখ মাসে বেশির ভাগ চাঁই পরিবারে সত্যনারায়ণপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুরের পুজো উপলক্ষে সমবেত ধর্মীয় আচার পালনের চল দেখা যায়। হবিবপুরের নদীতীরবর্তী এই সম্প্রদায়ের মানুষ আলই ব্রত ও কুমিরপুজো করেন। পৌষ জুড়ে আলইগানের পর সংক্রান্তিতে কুমিরপুজোর চল আছে তাঁদের মধ্যে।[২]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাস। এঁদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আধিক্য। বাদনা বা সোহোরায় (সহরায়) সাঁওতালদের মুখ্য অনুষ্ঠান। চাষবাসে গবাদি পশুকে বিশেষ যত্ন ও গুরুত্ব

দিতে এই উৎসবের উদ্ভব হয় বলে আদিবাসীদের বিশ্বাস। সাধারণত মাঘীপূর্ণিমায় পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব চলে। বাঙালিদের দুর্গাপুজোর মতো বাদনা উৎসবের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা হয়, দেওয়াল নিকানো হয়। বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়িতে আসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

পাঁচদিন ধরে চলতে থাকা, উৎসবের প্রথম দিনকে বলা হয় 'উম'। ওইদিন দুজন জগমাঝি মাদলের তালে গেয়ে চলেন গরু-মোষের বন্দনা। তবে পুজোর উপকরণ হিসাবে নতুন কুলো, ধূপ, সিঁদুর, আতপচাল, দূর্বা, কলা, বাতাসা, পচই, মুরগি ও পায়রা একত্র করা হয়। সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত ভোজ বাদনা পরবের অপরিহার্য অঙ্গ। আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে দ্বিতীয় দিন 'দাকা' উৎসবে মিলিত হন সাঁওতালেরা। উৎসবের তৃতীয় দিন 'ঘুন্টা'ও যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ থাকে। এ দিন আদিবাসী-গৃহস্থেরা তাঁদের সাজানো- গোছানো ঘরের সামনে খুঁটিতে গরু-মোষ বেঁধে রাখেন।

বাদনা পরবের চতুর্থ দিনে টামাক, বাদল ও ঝাঁঝর বাজিয়ে চলে সমবেত নাচগান। এই দিনকে তারা 'জালে' বলে। পঞ্চম দিনকে তারা 'হাকোঃ-কাটোকম' বলে থাকেন। এই দিন তাঁরা দেবতার কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

সাঁওতাল ছাড়াও মুণ্ডা, কোড়া, লোধা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসবের চল আছে। তবে তাঁরা কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু করেন। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে লক্ষ্মী বা ভগবতী নামে তাঁরা পুজো দেন। তবে আঙ্গিকের ভিন্নতা থাকলেও এই পার্বণের মূল সুর একই— গবাদি পশুর সুরক্ষা।

'বাহা' সাঁওতালদের আরেক সৃষ্টিশীল পার্বণ। গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ও পুরাতন মালদহ ব্লকের প্রায় প্রতিটি আদিবাসী গ্রামেই এই উৎসব পালিত হয়। ফাল্গুনের শুক্লা-দ্বাদশী থেকে বাহা পরবের শুরু। চলে দু'দিন ধরে। মূলত বনজসম্পদ সংরক্ষণের তাগিদে এই পার্বণের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন জাহের থানে দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেন পুরোহিত। এই উৎসবে পুরনো রীতির গান গাওয়া হয়। পুজোর উপকরণের সঙ্গে ডালায় সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন অস্ত্রে সিঁদুর মাখানো হয়। মূলত তিন দেবতাকে এই পুজোর নৈবেদ্য দেওয়া হয়— পঞ্চদেবতা (মেড়ে কো), জাহের এরা ও মারাং বুরু।

পুজোর পরে শিকারের মৃত পশুপাখির মাংস দিয়ে প্রস্তুত হওয়া খিচুড়ি বিতরিত হয় প্রসাদ হিসেবে। বাদনার মতো এই পুজোতেও সমবেত নাচগানের চল আছে। ঋতুরাজ বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রাতে মাদলের তালে সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা বাহায় মেতে ওঠেন। এই উৎসব শেষ হলে মহুয়া ফুল ও শালের ফুল তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন।

বাহা ও বাদনা ছাড়াও আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন পার্বণের চল আছে। ভালো ফসলের কামনা করে আষাঢ় মাসে বিভিন্ন দেবতাকে মুরগি উৎসর্গ করে 'এরক-সিম' উৎসব পালন করা হয়। একই ভাবে বীজ বোনার পর 'হাঁড়িয়ার-সিম' ও ফসল কাটার সময় 'জানথাড়' উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসে মারাং বুরুর পুজোর মধ্য দিয়ে 'সাকারাত' উৎসব। বৈশাখ মাসে বলি ও জাদুবিদ্যার মাধ্যমে 'মাকড় মে' উৎসব পালন করেন সাঁওতালেরা। সাঁওতালদের নিজস্ব পঞ্চায়েত-ব্যবস্থায় সদস্য পরিবর্তনের সময় 'মাঘ-সিম' পরব উদ্‌যাপিত হয়। আদিবাসীদের অন্যতম আচার শিকার-উৎসব। শিকারের যাওয়ার আগে আদিবাসী পুরুষেরা তাঁদের স্ত্রীর হাতের নোয়া খুলে নিয়ে যান। এর পরে 'বুল-মায়াম' ও 'দিহুরি'-র মধ্য দিয়ে বিপদ মুক্তির সংকেত পেলে শিকারিরা জঙ্গলে প্রবেশ করেন। শিকারের পর গ্রামে ফিরে এসে নাচ-গানের উৎসবে মেতে ওঠেন। সারহুল, কারাম, গরাম, বড়াম, গেরাম প্রভৃতি পুজো ও ধর্মীয় আচার টাঙন-অববাহিকার আদিবাসীদের নিজস্ব সম্পদ।[৩]

মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব :

ইদুলফিতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, সবেবরাত প্রভৃতি পার্বণ এ অঞ্চলের মুসলমানেরা পালন করে থাকেন। অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের মতোই এখানকার মুসলমানদের তিনটি প্রথা অবশ্য পালনীয়:

(১) ইমান : ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস।

(২) নমাজ : পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া উচিত। পাঁচ বারের নমাজের পাঁচটি ভিন্ন নাম আছে। সূর্যোদয়ের আগের নমাজকে 'ফজর', দুপুরের পরের নমাজকে 'জোহর', বিকেলের নমাজকে 'আসর', সূর্যাস্তের পরের নমাজকে 'মাগরিব' ও রাতের নমাজকে 'এষা' বলা হয়।

(৩) রোজা : হিজরি সন অনুযায়ী বছরের নবম মাস রমজান। এই মাসে দিবাভাগে পানাহার থেকে মুসলমানেরা বিরত থাকেন। আজকাল অনেক জায়গায় সান্ধ্য ইফতারে সমবেত ভাবে যোগ দেওয়ার চল শুরু হয়েছে।

নতুন চাঁদ দেখে ইদের আনন্দে মেতে ওঠেন মুসলমানেরা। অধুনা অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীদেরও এই পার্বণে শামিল হতে দেখা যাচ্ছে। ইদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। ইদুজ্জোহা বা কুরবানিতে অনেক মুসলমান অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাগ-মাংস বিতরণ করেন। সবেবরাতে কেউ কেউ আলোকসজ্জা ও কোরান পাঠের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন। তবে টাঙন-তীরের এলাকায় মহরমের উৎসবে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হয়। হবিবপুর, গাজোল, পুরাতন মালদহ ও বামনগোলার বিভিন্ন গ্রামে মহরমের নিজস্ব মাঠ আছে। মহরমের মিছিলে ছোটো-বড় সবাই অংশ নেন। মহরমের লাঠি খেলা দেখতে সব সম্প্রদায়ের মানুষই ভিড় করেন। যানবাহন থামিয়ে মহরমের জন্য চাঁদা আদায় করার চল শুরু হয়েছে।

ধনী মুসলমানদের জাকাত (দান) ও হজযাত্রায় শামিল হওয়া অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। কেউ কেউ এই কর্তব্য পালন করেন। তবে এই এলাকায় ফতেহা-দোয়াজ-দাহম ও ফতেহা-ইয়াজ-দাহম তেমন ভাবে পালিত হয় না।

উৎসগত কারণে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বরিন্দ এলাকার মুসলমানদের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলে আসা সম্প্রদায়গত ধর্মীয় আচার এখনও প্রভাব বিস্ত ার করে আছে। রাজবংশি সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত মুসলমানেরা বিয়ের সময় মৌলবিকে দিয়ে কলমা পড়ালেও বাইশকাণ্ডি, কলাগাছ পোঁতা, রাতে বিয়ে প্রভৃতি আচার পালন করেন। টাঙন-অববাহিকার অনেক মুসলমান-পরিবারে গো-মাংস নিষিদ্ধ। শেরশাহি-বাদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় আচারের কঠোরতা বেশি।

খ্রিস্ট ধর্মীয় উৎসব :

এ এলাকায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা নবীন। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে বিভিন্ন মিশনারি কার্যকলাপের ফলে তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। অন্যান্য সম্প্রদায়েরও কিছু মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। কেউ কেউ আর্থিক সুবিধে পাওয়ার প্রত্যাশাতে এই ধর্মান্ত রকরণের পথ বেছে নিয়েছেন।

মূলত বড়দিনের উৎসব ও রবিবারে গির্জায় যাওয়া ছাড়া আর কোনও ধর্মীয় আচারে শামিল হতে এখানকার খ্রিস্টানদের দেখা যায় না। বরং তাঁদের সদ্য ছেড়ে-আসা আচার- অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই আগ্রহ দেখান। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁদের অধিকাংশই নির্দ্বিধায় অংশ নেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার :

খুব কম সংখ্যক হলেও টাঙন-অববাহিকা এলাকায় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে গাজোলের রাইখানদিঘির তীরে এসেছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত।[৪] শিখগুরু নানক পুরাতন মালদহে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। ১৪৬৮-'৬৯ খ্রিস্টাব্দে এখানকার একটি গুরুদ্বারে তিনি অবস্থান করেন। তাঁর ব্যবহৃত উপকরণগুলি এই গুরুদ্বারে সংরক্ষিত আছে। এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য দুটি গুরুদ্বার আছে। গুরু নানকের জন্মদিনে প্রতিবেশী রাজ্যের শিখরাও গুরুদ্বার-দুটিতে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করেন।

এখানকার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কখনও কখনও বাইরে থেকে দিগম্বর সাধুরা এসে এঁদের ধর্মীয় উপদেশ দেন। গাজোল ও পুরাতন মালদহে জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়োয়ারির সংখ্যা বেশি।

বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও পুজোপার্বণে মেতে উঠলেও একটা ধর্মীয় সমন্বয়ের সুর টাঙনের মতোই এই এলাকায় স্রোতস্বী।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ পৃষ্ঠা-১৭৭

২. সেমিনার নিবন্ধাবলী : বাংলার লৌকিক অভিকরণ শিল্পকলা ও লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্র, ফেব্রু. ২০০৮, ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোশিয়েশ্যান অব ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা-১৩৯

৩. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ পৃষ্ঠা- ১৮৬-১৯০

৪. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা- ৯১

নবম পরিচ্ছেদ

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

টাঙন-তীরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাঁও, কোড়া, মাল, মালপাহাড়ি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তফশিলি জাতিভুক্ত রাজবংশি, পলিয়া, দেশি, নমশূদ্র, তিওর প্রভৃতি সম্প্রদায় এই অঞ্চলে গোষ্ঠীপ্রসার করেছে। উৎসগত দিক থেকে এ অঞ্চলের মুসলমানেরা দুটি ভাগে বিভক্ত:

১) নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুরে এঁদের আধিক্য।

২) শেরশাহি-বাদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরাতন মালদহ, যাত্রাডাঙা, মুচিয়া ও গাজোলের কিছু জায়গায় এঁদের দেখা যায়।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের তিন চতুর্থাংশ অধিবাসী তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মানুষ। উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্লক-সদরে বাস করেন। কিন্তু গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এদের মধ্যে জিইয়ে আছে। এর পেছনে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্কারই মূলত দায়ী। উপজাতি শ্রেণির লোকেরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। একই অবস্থা দেখা যায় রাজবংশি, পলিয়া, মুসলমান ও অন্যান্য

অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যেও। ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মাকেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকসংস্কার এঁদের চিকিৎসা- ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে এখানকার সমাজের এক শ্রেণির মানুষ ওঝা বা গুনিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মীরা গেলেও এইসব ওঝা-গুনিনের প্রভাব লুপ্ত হয়ে যায়নি।

তেলপড়া, জলপড়া, মন্ত্রপূত সরষেপড়া ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের প্রভাব এ অঞ্চলের মানুষের মনের গভীরে শিকড় বিস্তার করেছে। এমন বিশ্বাসকে পুঁজি করে অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও দু-পয়সা কামিয়ে নিচ্ছেন। গাজোলের করলাভিটার এমনই এক চিকিৎসক একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, তেলপড়া ও নিমডাল দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে রোগীদের 'সারিয়ে তোলেন'।

টাঙন অববাহিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু চমকপ্রদ লোকসংস্কার লক্ষ করা যায়। অনেক গ্রামে বট ও পাকুড় গাছকে পাশাপাশি রোপণ করে বটকে বর ও পাকুড়কে কনে সাজিয়ে তাদের বিয়ের আয়োজন করা হয়। পংক্তিভোজে আমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। রীতিমতো ঠাকুর-পুরুত ডেকে এই বিয়ের অনুষ্ঠান চলে। কোথাও কোথাও ব্যান্ডেরও ব্যবস্থা করা হয়। এতে গ্রাম্য মাতব্বরদের আভিজাত্য প্রকাশ পায়।

বৃষ্টি না-নামলে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করেন সম্ভ্রান্ত চাষিরা। ব্যাঙের বিয়ে দিলে আকাশে মেঘ জমতে পারে ও বৃষ্টি নামতে পারে এই বিশ্বাস পোষণ করেন অনেকেই। বৃষ্টির আহ্বানে সমবেত নমাজেরও চল আছে।

'লোঠাচান' টাঙন-তীরের এক বিশেষ লোকসংস্কার। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি হলে কৃষকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। গ্রামের যুবকেরা সে সময় লুকিয়ে অন্যের ভাঁড়ারের খাবার খেয়ে ফেলে। এতে ওই বাড়ির যুবকও জড়িয়ে থাকতে পারে। এই সময় সাধারণত গৃহস্থের ঘরে আম, কাঁঠাল, তালবড়া ও পিঠে মজুত থাকে। এসব চুরি করে খাওয়ার পরে গৃহস্থ যত গালিগালাজ করবে ততই বৃষ্টি আসন্ন হবে। যুব সমাজও এসময় কর্মহীন হয়ে পড়ে।

কালীপুজোর পরের দিন গরুর মাথায় তেল সিঁদুর দিয়ে গো-ডহরা পালন করেন এই এলাকার মানুষ। গরুকে খই-কলা খেতে দেওয়া হয়। এতে গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করার পাশাপাশি গোস্বাস্থ্য ভালো রাখার কামনা করা হয়। গৃহস্থের বিশ্বাস, এর ফলে গোদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। গ্রামে সন্তান জন্মালে বাঁশের চোঁচা দিয়ে মায়ের নাড়ি কাটার সংস্কার এখনো আছে। নবজাতকের মুখে কোলেস্ট্রামের বদলে প্রথম ছাগদুগ্ধ পান করানোর রেওয়াজ আছে। তবে ধীরে ধীরে আজকাল মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে।

টাঙনে মাছ ধরার সময় প্রথম মাছটিকে অনেক ধীবর পুনরায় নদীতেই ছেড়ে দেন। এতে বেশি মাছ ওঠার সম্ভাবনা থাকে বলে তাঁদের বিশ্বাস। টাঙনকে গঙ্গার তুল্য ভেবে স্নানের আগে খানিকটা জল মাথায় ছিটিয়ে নেন স্নানার্থীরা। টাঙনের বাইচে অংশ-নেওয়া পুরুষেরা নারীদের চোখে সৈনিকের মর্যাদা পায়।

তেনাপির শ্মশানমন্দিরের কাছে একটি গাছে অনেকেই ছিন্নবস্ত্র (তেনা) টাঙিয়ে রাখেন। তাঁদের বিশ্বাস, এখানে বস্ত্রখণ্ড টাঙিয়ে যা-কামনা করা যায় তা-ই প্রাপ্তি হয়। কৃষকদের মধ্যে লাঙল ধুয়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে লাঙল পুজো করারও চল আছে।

গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুরের কয়েকটি গ্রামে মন্ত্রশক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপুজো উপলক্ষে শ্রাবণ মাসে কয়েকজনের হাত মন্ত্রপুত করে বিষ চালনা করা হয়। তাদের কাঁপতে-থাকা হাত টানবার জন্য দুটি গোষ্ঠী মন্ত্রপাঠের সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। আদিবাসীদের মধ্যেও এ ধরনের প্রতিযোগিতার চল আছে। মন্ত্রশক্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে ছাগল, ভেঁড়া, শুয়োর ও মুরগি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

বিজ্ঞানের পাখনায় ভর করে আমরা একুশ শতকে প্রবেশ করেছি। ভোগবিলাসের আবর্ত ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু সমাজে ডাইনি সন্দেহে খুনের উন্মাদনা আজও অব্যাহত।

সমাজে পরছিদ্রান্বেষী সন্দেহ অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। কারও মুখ দেখলে দিনটা খারাপ যাবে কিংবা কারও নজরে কোলের শিশু অসুস্থ হয়ে পড়বে— এ ধারণা তথাকথিত অনেক শিক্ষিতই আজও পোষণ করেন। তবে

তা একটা গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই ধারণাকে কেন্দ্র করে খুনের পথ বেছে নিতে দ্বিধা করে না আদিবাসীরা।

আদিবাসী সমাজের অপদেবতার নাম বোঙা। আদিবাসীদের ধারণা, এই বোঙার প্রভাব যার উপর পড়ে সে ডাইনি বা ফুসকিন হয়ে যায়। এর ফলে সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। তবে এই ক্ষমতার সাহায্যে সে কারও ভাল কাজ করতে পারে না। কেবল অনিষ্টই করতে পারে। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ডাইনি বা ফুসকিন আদিবাসী সমাজের যে-কোনও ব্যক্তিকে 'খেয়ে ফেলতে' পারে। কী ভাবে 'খেয়ে ফেলে' বা ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তা নিয়ে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসটা মোটামুটি এক। যার উপর ডাইনির নজর পড়ে তার অসুস্থতা দেখা দেয়। এবং এই অসুস্থতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই অসুস্থ ব্যক্তির 'কলেজা' অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডটি মন্ত্রের সাহায্যে বের করে এনে অন্ধকার রাতে মাটির হাঁড়িতে রান্না করে খায় ডাইনিরা। মন্ত্রের সাহায্যেই তারা নাকি অসুস্থ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের জায়গায় গামছা বা কোনও বস্ত্রখণ্ড পুরে দেয়। এর পর অসুস্থ ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

না, এই ধারণার পেছনে ন্যূনতম বিজ্ঞান নেই। অথচ, ডাইনি সন্দেহের বলি হয়ে চলেছেন বহু নিরপরাধ আদিবাসী। ডাইনিদের হত্যা করলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, সামাজিক শান্তিও ফিরে আসে বলে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস। অনেক শিক্ষিত আদিবাসীও এ ধারণা পোষণ করেন। যদিও ব্যক্তি-স্বার্থ ছাড়া শিক্ষিত আদিবাসীরা নিরক্ষরদের সঙ্গে খুব কমই ওঠা-বসা করেন।

কিন্তু কেন এই ডাইনি-প্রথা আজও সমাজে টিকে আছে? আইনি কঠোরতা সত্ত্বেও ডাইনি অপবাদে আদিবাসী রমণীদের একের পর এক খুন হতে হচ্ছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা আদিবাসী সমাজকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু ডাইনি সন্দেহে পৈশাচিক হত্যালীলার মূল কারণ করুণ চিকিৎসা-পরিষেবা। আদিবাসী-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের যথেষ্টই অভাব আছে। নুন আনতেই যাদের পান্তা ফুরোয়, চিকিৎসার অভাবে তাদের ঘরে শুয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনও উপায় দারিদ্র্যজর্জর আদিবাসী গ্রামগুলিতে নেই।

অভাবগ্রস্ত আদিবাসীদের কেউ কেউ দূরবর্তী হাসপাতালে গেলেও বাইরে থেকে ওষুধ কেনার মতো সামর্থ্য থাকে না। বাধ্য হয়ে তাঁরা ঝাড়-ফুঁকের জন্য স্থানীয় 'মাহান'-এর কাছে যান। এই মাহান বা গুনিনেরা ঝাড়-ফুঁকের পাশাপাশি অনেক সময় কবিরাজি ওষুধও দিয়ে থাকেন। তাতে কোনও কোনও রোগী সেরেও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই নিরক্ষর মাহানেরা এমন কিছু গাছ-গাছড়া প্রয়োগ করেন যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় রোগ জটিলতর আকার ধারণ করে। এমন-কী রোগীর মৃত্যুও ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোনও মাহান বা গুনিনের প্রতি দোষারোপ করেন না আদিবাসীরা। বরং তাঁরা আরও নিশ্চিত হন যে, মানুষবেশী কোনও ডাইনি রোগীকে খেয়ে ফেলেছে।

রোগী বাঁচুক বা না-বাঁচুক, মাহানের কাছে ব্যর্থ হলে আদিবাসীরা জানগুরুর শরণাপন্ন হন। জানগুরু আসলে আদিবাসী সমাজের গনতকার। গ্রামের মোড়লও তাঁর কথাকে অব্যর্থ বলে মনে করেন। যে-কোনও এলাকার যে-কোনও জানগুরুকেই আদিবাসীরা দেবতুল্য সম্মান জ্ঞাপন করেন। লোকঠকানো চিকিৎসা ও ডাইনি চিহ্নিত করার কাজে জানগুরুরা সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেক জানগুরুর ডেরাতেই কিছু সাকরেদ বা এজেন্ট থাকেন। এঁরা বাহ্যত আপ্যায়নকারী কিংবা অন্য এলাকার বাসিন্দার ভূমিকা নেন। পরিচয় গোপন রেখে আলাপ করতে করতে তাঁরা আগন্তুকদের সমস্যা ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা জেনে ফেলেন। এজেন্টদের সহায়তায় জানগুরুরা গণনায় বসেন। তার আগেই অবশ্য আগন্তুক-দলের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ফি আদায় করে নেন। গণনার শেষে জানগুরুরা ওই সব নামের আদ্য-বর্ণ বা তাঁদের বাসস্থানের সঙ্কেত দিতে থাকেন। অনেক সময় সন্দিগ্ধ নামও বলে দেন। সর্বস্বান্ত হলেও আদিবাসীরা জানগুরুর নির্দেশকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেন। এর পরে তাঁরা দ্বিধাহীন ভাবে খুন করতে এগিয়ে যান। তা সে নিকট আত্মীয় হোন বা গর্ভধারিণী মা-ই হোন— ডাইনি চিহ্নিত হওয়ার পর তাঁকে আর মানুষ বলেই মনে করতে পারেন না আদিবাসীরা। এই খুনের সময় তাঁরা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেন। ডাইনি সংক্রান্ত সব কটি খুনের ঘটনা ঘটেছে কুপিয়ে বা পিটিয়ে। এই হত্যাকাণ্ডে আদিবাসীরা কখনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন না।

আদিবাসী রমণীর মুখে কারও মরার কথা আনা নাকি চরম অশুভ। কারও অসুস্থতা দেখে যদি কোনও আদিবাসী রমণী 'সারবে না' বা 'বাঁচবে না' বলে মন্তব্য করেন তবে তাঁকে ডাইনি হিসাবে আখ্যা দিয়ে মেরে ফেলেন তাঁর পরিবারের লোকেরাই। এক্ষেত্রে জানগুরু ছাড়াই আদিবাসীরা সিদ্ধান্ত নেন। তবে শাস্তি সম্পর্কে তাঁরা তোয়াক্কা করেন না। তাই হত্যাকারীরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ডাইনি সন্দেহে খুনকে তাঁরা গৌরবের বলে মনে করেন।

ডাইনি সংক্রান্ত হত্যায় মালদহ জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত বরিন্দ এলাকা বারবারই সংবাদের শিরোনাম হয়ে ওঠে। এখানকার গাজোল ব্লক ডাইনি সংক্রান্ত হত্যায় দেশের শীর্ষে। ১৯৮৩ থেকে এ পর্যন্ত গাজোলে ডাইনি সংক্রান্ত খুনের শিকার ৫১ জন। এর মধ্যে গত কুড়ি বছরে খুন হয়েছেন ৩৮ জন। ডাইনি অপবাদে খুনের ভয়ে এখানকার ডজনখানেক আদিবাসী-রমণী আজও ঘর ছাড়া। হয়ত তাঁরা কোথাও বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন।

কিন্তু এঁরা সত্যিই ডাইনি কি না তা ভাববার মতো মানসিকতা নেই মধ্যযুগীয় বর্বরতায় আছন্ন আদিবাসীদের। তাই ফাঁসির আদেশেও তারা আদৌ ভীত হয় না। অন্য দিকে, ডাইনি সংক্রান্ত বলির নেপথ্য নায়ক জানগুরুদের মাঝে-মধ্যে পুলিশ ধরপাকড়, করলেও ছাড়া পেয়েই তাঁরা আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠেন।

বস্তুত, আদিবাসীদের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার এমন ভাবে আঁকড়ে আছে যে, সহজে এই প্রথা রদ করা মুশকিল। আদিবাসীদের মধ্যে মূলত সাঁওতাল ও কোড়া সম্প্রদায়ের পুরুষেরা যক্ষ্মারোগে ও মহিলারা রক্তাল্পতায় ভোগেন। সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে, যোগাযোগসঙ্কুল ও বিদ্যুৎবিহীন আদিবাসী গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মীরা ঠিকমতো যান না। স্বল্পাহারে দিন অতিবাহিত হয় গ্রামবাসীদের। তাই অপুষ্টি আদিবাসী শিশুদের নিত্যসঙ্গী। সাক্ষরতা প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও আদিবাসীদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ খুব কমই নেওয়া হয়েছে। এই ইন্টারনেটের যুগে বাস করেও পশুবলির মতোই ডাইনি সন্দেহে নরবলি ঘটে চলেছে। অথচ, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিং ভারতের আদিবাসী-সমাজে নরবলি প্রথা নিষিদ্ধ করতে আইন জারি করেন।

ডাইনি-প্রথা নির্মূল করার আন্তরিক উদ্যোগের এখনও যথেষ্ট ঘাটতি আছে। কালে-ভদ্রে একদিন চিকিৎসা-শিবির কিংবা ঠাণ্ডা ঘর থেকে বক্তা এনে আলোচনা-সভার আয়োজন করলে এই কুসংস্কার কখনও দূর করা যাবে না। ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় না-রেখে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসে জোরালো আঘাত আনতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের। জানগুরুদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা দরকার জনপ্রতিনিধিদের। নইলে শুধু আইনের ভয় দেখিয়ে এই প্রথা রদ করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ আদিবাসী পুরুষ 'পচানি' বা 'হাড়িয়া' নামের এক প্রকার পানীয়তে আসক্ত। হাড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে এঁরা সমাজ-সংস্কার ভুলে যান। বেশির ভাগ ডাইনি-ঘাতক নেশাসক্ত হয়েই খুন করেন।

কাজেই সার্বিক স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে গেলে তাঁদের নেশা থেকে বিরত রাখতে হবে। হাড়িয়া তৈরির প্রধান উপকরণ এক প্রকার ভেষজ মিশ্রণের গুলি খোলা বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়। এই গুলি যদি তাঁরা না-পান হাড়িয়া তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে প্রশাসন ও আবগারি বিভাগকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

অনাথ বিধবার সম্পত্তি দখলের লোভে তাঁকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে খুন করার ঘটনাও দু-একটি ঘটেছে। তবে এ ধরনের খুনের ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। চিকিৎসার অভাবই এর প্রধান কারণ। তাই স্বাধীনতার একষট্টি বছর পরেও গ্রামের মানুষকে তুকতাক ও জলপড়ার ওপর ভরসা করতে হয়। তবে যেসব গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে সেখানে ডাইনি সংক্রান্ত খুনের ঘটনা কম ঘটে। প্রত্যেকটি গ্রামে যদি ঠিকমতো চিকিৎসা-পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় তবে ডাইনি সংক্রান্ত খুনের ঘটনা নির্মূল হতে বাধ্য। একই সঙ্গে শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও রাস্তা এই তিনটি চাহিদাও পূরণ হবে।

ডাইনি ভেবে যাঁকে খুন করা হয়, তিনি যে তাঁদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ—এ কথা বিস্মৃত হয়ে যান ঘাতকেরা । বাস্তবে ডাইনি বলে কিছুই নেই। কিন্তু সে কথা বোঝাবে কে? জানগুরু বা মাহানের কাছে না-গিয়ে, দূরে হলেও, হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। তবেই এই নির্মম সামাজিক অভিশাপকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব। নইলে এই সহস্রাব্দেও আদিবাসী-রমণীরা বাঁচার জন্য নিরাপত্তার অক্সিজেন খুঁজতে থাকবে।

গাজোলের ডাইনি-ঘটিত খুনের তালিকা [১]

ক্রমাঙ্ক	তারিখ	স্থান	নাম	মন্তব্য
১।	১৫.০৫.১৯৮৮	বাজে ঝাড়শাবল	পানি কিস্কু	
২।	২৭.০৫.১৯৮৮	ধাওয়েল	বেটিয়া হেমরম	
৩।	২৫.১২.১৯৮৮	রাজাদিঘি	কাঁদো হাঁসদা	
৪।	২৫.১২.১৯৮৮	রাজাদিঘি	দেলহো সরেন	কাঁদোর স্বামী
৫।	২৭.০১.১৯৮৯	বটতলি	ছোটকা হেমরম	
৬।	১৫.০২.১৯৮৯	হবিনগর	সাঁঝলি হেমরম	
৭।	১৫.০৩.১৯৮৯	ছয়ঘাটি	মতি মুমু	
৮।	২৮.০৩.১৯৮৯	বাঁশঝুড়ি	ফুলমণি সরেন	
৯।	১১.০৮.১৯৮৯	বেগুনবাড়ি	বডগে মার্ডি	
১০।	০১.০৯.১৯৯০	বাবুইডাঙা	শ্যাম মুর্মু	
১১।	২৭.১১.১৯৯০	হেকরাডাঙা	পাড়ুয়া হাঁসদা	
১২।	২৯.০৫.১৯৯১	পারইল	মাইকো মুর্মু	
১৩।	০৪.০৯.১৯৯১	শ্যামনগর	সুমি মার্ডি	
১৪। ছেলের	০৪.০৯.১৯৯১	শ্যামনগর	সোহরাই কিস্কু	ঘাতক সুমির হাতে পাল্টা খুন
১৫।	০২.১১.১৯৯১	চাঁদপুর	মালোহো হেমরম	
১৬।	০২.১১.১৯৯১	পূর্ব কসবা	মংলি হেমরম	
১৭।	১৯.০৪.১৯৯২	রাজাদিঘি	বিটিয়া মুর্মু	
১৮।	২১.০৬.১৯৯২	ঝাড়শাবল	আচ্ছি টুডু	
১৯।	২১.০৬.১৯৯২	ঝাড়শাবল	অজ্ঞাত পরিচয়	আচ্ছির ছেলের হাতে পাল্টা খুন
২০।	০৯.০৭.১৯৯২	সরষাটুলি	ঝানু মুর্মু	
২১।	১৯.০৫.১৯৯৩	বটতলি	নির্মল মণ্ডল	
২২।	১০.০৬.১৯৯৩	বটতলি	দুখিনী মণ্ডল	নির্মলের স্ত্রী
২৩।	১৩.০৯.১৯৯৫	কাঞ্চনবাড়ি	সুরমা মুর্মু	খুনি ভাই-বউ ফুলমনি
২৪।	৩০.০৬.১৯৯৬	মধুডাঙা	ফুল মার্ডি	ফুলের স্বামী কৃষ্ণ কিস্কু জখম
২৫।	০১.০১.১৯৯৭	চন্দ্রাইল	ধীরেন রাজবংশী	১৭.০৫.'৯৭-এ ডোবা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার
২৬।	২৬.০৩.১৯৯৮	সিঁদুরবোনা	সুমি মার্ডি	ছেলের হাতে খুন

২৭।	২৯.১১.১৯৯৮	শহরপুর	মণি টুডু	
২৮।	০৫.০৭.১৯৯৯	বটতলি	সুমি হাঁসদা	
২৯।	২৮.১১.২০০১	মধুডাঙা	সুমি মুর্মু	২৩.০১.'০২-এ মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ উদ্ধার
৩০।	১৮.১২.২০০২	সরষাটুলি	দুলালী হেমরম	২১.১২.'০২-এ বোলবাড়ির পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার
৩১।	২৪.১২.২০০২	আলমাসপুর	হোপনি সরেন	খুনি ছেলে। ১০০ টাকায় বেচা কাটা মুণ্ড উদ্ধার (২.৬.'০৩)
৩২।	২৩.০৭.২০০৪	বুমকা	শাওনা সরেন	
৩৩।	১৯.০১.২০০৫	শালবোনা মোড়	কাজলি মার্ডি	
৩৪।	১২.০৪.২০০৫	আরাজি জালসা	সাঁঝলি মুর্মু	কাকিমার হাতে খুন
৩৫।	১৫.০৫.২০০৬	বুজুভিটা	পুর্গি সরেন	
৩৬।	০২.০২.২০০৮	সরষাটলি	রামাইত টুডু	ছেলের হাতে খুন
৩৭।	১৯.০৯.২০০৮	পিরপাড়া	রমেশ মার্ডি	
৩৮।	১১.১০.২০০৮	রঘুনাথপুর	বাহা বেসরা	

এই তালিকার বাইরেও টিয়াকাটির ইসি সরেন ও তাঁর মেয়ে লছমি টুডু, মাহিনগরের ভুলকু টুডু, কুলমুঝুড়ির খাপরো হেমরম, মুদাপুরের বাহা মার্ডি, মাঝি সরেন ও রানি কিস্কু ডাইনি সন্দেহে খুন হয়েছেন। কিন্তু ঘটনার ঠিক তারিখ জানাতে পারেননি তাঁদের পরিবারের লোকেরা।[২]

অন্য দিকে, ডাইনি সন্দেহে খুন হওয়ার ভয়ে অনেক আদিবাসী এখনও ঘর ছাড়া। রুইমারির ডোবা হেমরম, গাইকুড়ির দামধর কিস্কু ও টেলে কিস্কু, রাজাদিঘির লক্ষ্মী সরেন, নোহা সরেন ও লক্ষ্মী হাঁসদা, পাডোলের সীতা মুর্মু ও

নাসো সরেন, মিরজাদপুরের রাইমতি হেমরম, নওগাঁর মণি মুর্মু, লকড়িপিরের সখি সরেন খুনের আশঙ্কায় অন্যত্র হয়ত বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন।[৩]

তবে গ্রামে কাজের অভাবে ভিন রাজ্যের কাজে পাড়ি দিয়ে ফেরার সময় সেখানকার সংস্কৃতির প্রভাবে মানসিকতা বদলে ফেলেছেন অনেকেই। তাঁদের কেউ কেউ ডাইনি সন্দেহের পরিবর্তে অসুখ-বিসুখে চিকিৎসাকেন্দ্রের আশ্রয় নিচ্ছেন। ইদানিং গ্রামের আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেতে থাকায় জানগুরুদের দাপটে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। তাঁরা সমবেত হয়ে মদ্যপ পুরুষদের নেশার ঠেক ভেঙে দিচ্ছেন। সমাজ-সংস্কারের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির এই স্বশাসিত উদ্যোগ অনেককেই প্রাণিত করছে। তাই ঠুনকো আইন বা তথাকথিত অভিযান করে নয়, ডাইনি সন্দেহে হত্যার হয়ত ইতি ঘটাতে পারেন গ্রামের ক্যামেলিয়া-দশভুজারাই।

তথ্যসূত্র :

১. ডাইনি হত্যার শীর্ষে গাজোল (প্রতিবেদন) — গৌরাঙ্গদেব ভার্মা, 'যুগান্তর' পত্রিকা, ৯ মার্চ ১৯৯৪

২. উন্নয়ন বঞ্চিত গাজোল ব্লক ডাইনি হত্যার শীর্ষে (প্রতিবেদন)— সত্যনারায়ণদেব ভার্মা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৪

৩. আজও ডাইনি (প্রতিবেদন) — গৌরাঙ্গদেব ভার্মা, গাজোল মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ২০০৬-'০৭ পৃষ্ঠা- ৬১

দশম পরিচ্ছেদ

মেলা ও উৎসব

মানুষের সমবেত হওয়ার প্রয়াস থেকেই মেলার উদ্ভব। মেলা মানুষের সামাজিক বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম। লোকায়ত ও আধুনিক সঞ্চরণশীল আয়োজনের আর এক নাম মেলা।

প্রবহমান মানবজীবনের বৈচিত্র্য আনতে উৎসবের জুড়ি নেই। উপলক্ষ যা-ই হোক, উৎসব মানুষের প্রাণকে নতুন ভাবে স্পন্দিত করে। মেলা ও উৎসব কার্যত একে অপরের পরিপূরক। দুই-ই মানুষকে সংঘবদ্ধ করে। সংহতি দান করে। আর সর্বোপরি নির্ভেজাল আনন্দের জোগান দেয়। টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে মূলত তিন ধরনের মেলা ও উৎসবের প্রাধান্য: ক) ধর্মীয়, খ) সামাজিক ও গ) রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়। বাণিজ্যিক মেলা-উৎসবের তেমন চল নেই।

ক) ধর্মীয় মেলা ও উৎসব :

দুর্গাপুজো, কালীপুজো, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি উরুষ প্রভৃতি উপলক্ষে চিরাচরিত মেলা বসে টাঙন-তীরের অনেক জনপদে। হবিবপুর, কেন্দপুকুর, জগদলা, বুলবুলচণ্ডী, সাহাপুর, কাটিকান্দর, গোবিন্দপুর, আলাল, আমলিডাঙা, বলরামপুর, বামনগোলা, আহোড়া, আলমপুর, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি এলাকায় ধর্মীয় মেলা ও উৎসবের প্রাচুর্য। বামনগোলার শিবডাঙির শিবমন্দিরে প্রতিবছর

ভাদ্রপূর্ণিমা থেকে সপ্তাহ ব্যাপী বিরাট মেলা বসে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শিবমন্দিরে পুজো দিতে বিহার ও ঝাড়খন্ড থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

বানপুরের ঝাপড়িকালীমেলা বসে ফি-বছর রামনবমী তিথিতে। বৈশাখের শনি ও মঙ্গলবারে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা মায়ের পুজো দিতে আসেন। এ উপলক্ষে সেখানে জনচাঞ্চল্য থাকে। হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীতে কালীপুজো উপলক্ষে দু-সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। বরিন্দে সর্বাধিক লোকের সমাগম হয় গাজোলের দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর মেলাতে। আদিবাসীদের সমাগমে এই মেলা দুটি পৃথকমাত্রা ধারণ করে। হোলির পরের দিন গাজোলের আমলিডাঙার মেলা ও চৈত্র পূর্ণিমায় হবিবপুরের সজনার মেলা শুধুই আদিবাসীকেন্দ্রিক।

উরুষ উপলক্ষে গাজোলের পাণ্ডুয়ায় দু-সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। রাজ্যের নানা প্রান্তর তো বটেই, ভিন রাজ্যগুলি থেকেও প্রচুর ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মেলায় যোগ দেন। হিজরি সনের রজব মাসের ২২ তারিখ থেকে পাণ্ডুয়ার বড় দরগাকে ঘিরে এই মেলা বসে।

গাজোলের ধাওয়েল গ্রামে মাঘীপূর্ণিমায় শুরু হয় কংসব্রত মেলা। মেলার প্রথম দিন গ্রামের সবাই আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকেন। সন্ধ্যায় একটি যজ্ঞের আয়োজনে তাঁরা সমবেত হন। সেখানে কিছু শস্য একটি মাটির সরার মধ্যে রেখে যজ্ঞের আগুনে দিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেবছর ফলন কেমন হবে ও শস্যের বাজারে দাম কেমন মিলবে।

বরিন্দ এলাকায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উপলক্ষে বিভিন্ন জনপদে মেলা বসে। গাজোলের ফতেপুর, হাতিন্দা, ধ্যামধেমা; হবিবপুরের বুড়িতলা, শ্রীকৃষ্ণপুর; বামনগোলার মালতী, বোদরা, শালালপুর, বিনতারা, মোহনপুর, গোয়ালজয়, চাঁদপুর, হরিশঙ্করপুরে গম্ভীরা মেলা আয়োজিত হয়।

শ্মশানকালীকে কেন্দ্র করে বামনগোলার গোবরাকুড়ি, হবিবপুরের মানিকোড়, গাজোলের কৃষ্ণপুর, শালুকা, পাইল প্রভৃতি এলাকায় ধর্মীয় মেলা বসে। এইসব মেলায় বাউল, কীর্তন, আলকাপ ও পঞ্চরস পরিবেশিত হয়। বাঁকড়-বাহাদুরপুরে হোলির পনেরো দিন পরে শ্মশানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। হবিবপুরের নয় মাইলের ধারেন্দা ও বোদরায় জ্যৈষ্ঠ মাসে গাঞ্জুরা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফি-বছর খোকসনে বুড়িমেলা, পার-হবিনগরে গঙ্গামেলা, তেঁতুলতলায় শিবমেলা, তিতপুরে তারাকালীমেলা বসে। গাজোলের তারাতলায় দুর্গাপুজোর পরে শুক্লা-চতুদর্শী থেকে তারাকালীপুজো উপলক্ষে দশদিন ধরে মেলা বসে। আর পাঁচটা মেলার মতোই বিভিন্ন সামগ্রী ও উপকণের সমাহার থাকলেও লোকগান ও আধুনিক গান এই মেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মাঘীপূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে টাঙন-তীরবর্তী জনপদগুলি মেলার আকার ধারন করে। এখানকার কয়েকটি খাড়ি ও বড়জলা সেদিন গঙ্গার মর্যাদা পায়। বেশির ভাগ জায়গাতেই তিন দিন থেকে সাত দিন ধরে মেলা বসে।

আষাঢ়ে রথযাত্রার মেলা ও চৈত্রে চড়কমেলা বরিন্দ এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। গাজোলের বোলবাড়ি, শালবোনা, কাটিকান্দর, হবিবপুরের আইহো, বামনগোলার নালাগোলা, পুরাতন মালদহের সাহাপুর প্রভৃতি এলাকায় চড়ক উপলক্ষে একদিনের জমজমাট মেলা বসে। চৈত্র সংক্রান্তির এই মেলায় গোধূলিতে উপস্থিত হয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে দেখতে পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের জন্য প্রত্যাশা করতে থাকেন দর্শনার্থীরা। বারিন্দায় মহামায়াপুজো উপলক্ষে মেলা বসে। বরিন্দের সবচেয়ে বড় রাসমেলা বসে গাজোলে। রাসযাত্রা উপলক্ষে এত বড় মেলা মধ্যবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না। দু-সপ্তাহ ধরে চলে এই মেলা। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে এই মেলা আয়োজিত হলেও কীর্তন-বাউল-যাত্রার পাশাপাশি চটুল হিন্দি নাচ, লটারি, কান-ফাটানো মাইকের তাড়না জনজীবনকে বিব্রত করে তোলে।

মহরম, ইদ ও মিলাদ-উল-নবি উপলক্ষে গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর ও পুরাতন- মালদহের অনেক জায়গায় মেলা আয়োজিত হয়।

খ) সামাজিক মেলা :

সামাজিক মেলা ও উৎসব ধর্মীয় আচারের উপর ভর করে নয়, ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করার স্বার্থে সামাজিক মেলা ও উৎসবের আয়োজন। বামনগোলার মদনাবতীর কেরি মেলা, গাজোলে গাজোল উৎসব ও পুষ্পপ্রদর্শনী, হবিবপুরে সিধু-কানু-বিরসা-জিতু মেলা এই উৎসবস্রোতের তরণী।

১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি নীলকুঠির দায়িত্ব নিয়ে মদনাবতীতে আসেন।[১] সাড়ে পাঁচ বছর ধরে এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে এই জনপদের মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এই অবস্থানকে স্মরণ করে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি কেরি- মেলা আয়োজিত হয়। সাহিত্য ও কবিতা পাঠের আসর এই মেলার অন্যতম প্রাপ্তি।

বরিন্দের বৃহত্তম সামাজিক মেলা 'গাজোল উৎসব'। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে পুষ্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই উৎসবের শুরু। ১৯৯৮ থেকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা রুদ্রবীণার পরিচালনায় ও গাজোল হর্টিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এই মেলায় সংযোজিত হয় শিশু উৎসব। ধীরে ধীরে এখন তা বিরাট আকার নিয়েছে। ৭৫টি বিভাগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব শুরু হয় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে। তবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রারম্ভিক পর্বের সূচনা হয় তার এক সপ্তাহ আগেই। গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গাজোল বি এস এ স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও গাজোল হাইস্কুল ময়দানে মূল অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় কেব্‌ল চ্যানেলের মাধ্যমে ঘরে বসেই অনেকে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

হবিবপুরে প্রয়াত আদিবাসী নেতা জিতু হেমরমের বংশধরেরা বাস করেন। ইংরেজদের সঙ্গে আদিনা মসজিদের একপ্রান্ত থেকে যুদ্ধ করেন জিতু। বন্দুকের নলের সঙ্গে তির-ধনুকের অসম লড়াইয়েও তিনি পারদর্শিতা দেখান।

সন্ধিপ্রস্তাব পেশ করে ইংরেজরা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক জমিদারকে দিয়ে গুলিবিদ্ধ করান। এই ঘটনাকে স্মরণ করে হবিবপুরে প্রতি বছর সিধু-কানু-বিরসা-জিতু মেলা আয়োজিত হয়। এ উপলক্ষে আদিবাসীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

নববর্ষ, নবান্ন, বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে এই এলাকার অনেক গ্রাম সামজিক উৎসবে সেজে ওঠে। রাজবংশী-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে নবান্ন একটি সামাজিক মিলনোৎসব।

গ) রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মেলা ও উৎসব :

প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস প্রভৃতি উপলক্ষে বরিন্দের বিভিন্ন এলাকায় উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এসব উৎসব একটা সর্বজনীন রূপ লাভ করে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন রক্তদান শিবির, চিকিৎসা পরিষেবা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজন করে। ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস ও ২ অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিন উপলক্ষে টাঙন-তীরের কয়েকটি সংস্থা ফল বিতরণ, সাফাই অভিযান, আলোচনা সভা প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

যে-উপলক্ষেই মেলা ও উৎসব আয়োজিত হোক না কেন টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের জনপদে একটা অতিরিক্ত আন্তরিকতার ছোঁয়া মেলে। যার

ফলে অভাব ও দৈন্য সত্ত্বেও এখানকার মানুষদের মন বছরের প্রতিটি দিনই উৎসবমুখর থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-১০২

একাদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

মালদহের টাঙন নদীর অববাহিকার প্রাণচঞ্চল জনজীবনে পরোক্ষ ভাবে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক প্রভাব সঞ্চরণশীল। এরই প্রেক্ষিতে অনেক সময় সচেতন বা অচেতন ভাবে রাজনৈতিক আবর্তে প্রবেশ করছেন অনেকেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুপ্ত-পাল-সেন রাজত্বে যে-রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দীপনা দেখা গেছে, মুসলমান আমলে তা আরও পুষ্ট হয়েছে। এই উদ্দীপনা কখনও অস্থিরতা, কখনও সংশয় আবার কখনও অনুগ্রহের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজ রাজত্বে দেশ জুড়ে যে-জাতীয়তাবাদের সঞ্চার হয়েছিল বরিন্দ এলাকাও তার বাইরে ছিল না। বরং এখানকার বীরদর্পী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে শুধু ইতিহাসেই নয়, মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অবস্থান করছেন একঝাঁক ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে জিতু হেমরম (রানিপুর), নরেশচন্দ্র সরকার (বুলবুলচণ্ডী), মহেন্দ্রনাথ দাস সরকার (আলাল), ভৈরব রায় (তিলাসন), রঘু দেশি (ভবানীকোঠা), রাধেশচন্দ্র শেঠ (পুরাতন মালদহ), হরিনন্দন ব্রহ্মচারী (হবিবপুর), প্রিয়নাথ ঘোষ (সিঙ্গাবাদ) প্রমুখ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তবে ইতিহাস যা-ই বলুক, একুশ শতকে প্রবেশ করে এই এলাকার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। তথাকথিত আধুনিকতার ঝাপটায় লোকায়ত সংস্কৃতি বাস্তবেই বিপন্ন। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও মননে এই রূপান্তরের প্রভাব স্পষ্ট।

স্থানীয় এলাকায় পর্যাপ্ত কাজের অভাবে ভিন রাজ্যের দাসত্বের শিকার এখানকার বহু মানুষ। মধ্যযুগীয় দাদনপ্রথার দাস হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সঙ্গী করে দালালদের পাতা ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা। হাজার হাজার মানুষ অস্থায়ী চুক্তির সাপেক্ষে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি এলাকায় কাজের জন্য পাড়ি দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই হাড়-ভাঙা পরিশ্রম। চিকিৎসা ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা নেই। দালালেরা কোনও রকম করে এঁদের শ্রম শুষে নিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছেন। ফেরার সময় অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি সঙ্গে নিয়ে আসছেন। কাজে গিয়ে কেউ কেউ মারাও যাচ্ছেন। কিন্তু এর কোনও সুরাহা নেই। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পে বছরে ১০০ দিনের কাজ স্থানীয় ভাবে পাওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। তাই ভিন রাজ্যের কাজের উপর ভর করেই সংসার নির্বাহ করছেন বরিন্দের অজস্র পরিবার।

যদিও নিজেদের উদ্যোগে যাঁরা কাজে যাচ্ছেন তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দ আয় করছেন। অনেকেই অন্য রাজ্যের সংস্কৃতিকে মনে গেঁথে নিয়ে ফিরছেন। এতে কোনও কোনও পরিবারের চালচিত্র বদলে গেছে। সন্তানদের স্বেচ্ছায় স্কুলে পাঠাচ্ছেন অভিভাবকেরা। ডাইনি প্রথার মতো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন ভিন রাজ্য থেকে ফিরে-আসা আদিবাসীরা। জানগুরু-জমানার অবসান ঘটাতে এখন আদিবাসী মহিলারাও সরব হয়েছেন। বরিন্দের সংস্কৃতিতে এটি ইতিবাচক সংযোজন।

টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ও সুলভ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাবে এইসব এলাকার যুবক-যুবতীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে। প্রেমঘটিত বিয়ের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের বদলে লাম্পট্য প্রাধান্য পাচ্ছে। গ্রামীণ মহিলাদের কেউ কেউ শাড়ির পরিবর্তে নাইটি, হাউস কোট প্রভৃতি পরিধানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। পারিবারিক ও সামাজিক বাঁধনে শিথিলতা এসেছে। শহরের মতো গ্রামেও একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

পরিবর্তন এসেছে বাসগৃহেও। টালি-খোলার বদলে টিনের চালা বাড়ছে। বেশির ভাগ বাসগৃহ মাটির হলেও পাকা বাড়ি তৈরির প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত গ্রামে চাকরিজীবীরা গৃহঋণ নিয়ে বাড়ি তৈরি করছেন। তবে গ্রামের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের অনেক বাড়িতেই শৌচাগার নেই। স্বাস্থ্য-সচেতনতার অভাবে জীবাণুঘটিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামেও খাদ্যাভাসে পরিবর্তন এসেছে। অনেকেই ইদানিং রাতে ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছেন। কম বয়সীদের মধ্যে পরটা, মোমো, চাউমিন, ম্যাগি প্রভৃতি খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। গ্রামীণ এলাকাতেও বিকোচ্ছে ঠাণ্ডা পানীয়। পিঠে-পুলির চল কমছে।

চাকরিজীবী হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে শহরমুখো হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু জনপদের সংখ্যা কমছে। কিন্তু

মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের গ্রামীণ অনুরাগের ফলে এমনটা ঘটছে। যে-কোনও সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামে থাকলে ক্রমশ তা বর্ধিষ্ণু হয়। কিন্তু এখানকার বেশির ভাগ গ্রামেই এর উলটোটা ঘটছে।

কৃষিতেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। কাঠের লাঙলের বদলে মোটরচালিত ট্রাক্টরের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। অনেক এক-ফসলিতে জমিতে ধান চাষের পর গম ও সবজি চাষ হচ্ছে। উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদ করে বরিন্দের অনেক কৃষক উত্তর ও দক্ষিণের কয়েকটি জেলাতে শস্য-সবজি জোগান দিচ্ছেন। গাজোলের আহোড়া, ময়না, হাতিমারি; হবিবপুরের কেন্দপুকুর, ঋষিপুর, কানতুর্কা; বামনগোলার পাকুয়াহাট, নালাগোলা, জামতলা এবং পুরাতন মালদহের নবাবগঞ্জ, সাহাপুর প্রভৃতি এলাকা চাষে প্রভূত উন্নতি করেছে।

বরিন্দে খনি ভিত্তিক কোনও কাজ নেই। তাই কৃষিজ ফসল উৎপাদন ও মৎস্য উৎপাদন এখানকার প্রধান জীবিকা। তবে মাঝারি ও ছোট শিল্পের কয়েকটি কারখানা আছে। অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ সেখানে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পান। ব্যবসাকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবিকার ক্ষেত্র প্রশস্ত হচ্ছে। সড়ক ও রেল যোগাযোগ ভাল থাকায় বরিন্দের জনপদে ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। দুর্বৃত্তায়ন কম হওয়ায় এসব এলাকায় মোটা পুঁজির ব্যবসাও

চলে। এজন্য শহর-ঘেঁষা জনপদগুলির জায়গার দাম আকাশছোঁয়া। পরিষেবামূলক কাজের ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে।

আমকে কেন্দ্র করে টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। পুরাতন মালদহ, গাজোল ও হবিবপুরে প্রচুর আমবাগান আছে। প্রত্যেক মরশুমে আমবাগান বেশ কয়েক বার হাত-বদল হয়। পুরনো পাতা দেখে, নতুন কচিপাতা দেখে, মুকুল দেখে, গুটি দেখে, অপরিণত ফল দেখে ও শেষ ধাপে পরিণত ফল দেখে হাত-বদলের সমাপ্তি ঘটে। পাকা আম পাড়ার পরে খুচরো কিংবা পাইকারি বিক্রি হয়। তবে কাঁচা আমের কোনও আলাদা বাজার নেই। গ্রামাঞ্চলে শস্যের বিনিময়ে বাকিতে আমচারা কেনা-বেচা চলে। অনেকে কোনও পুঁজি বিনিয়োগ না-করেই বাগান ও ফল কেনা-বেচার কাজে মধ্যস্থতা করে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করেন। এখানকার আম মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে রফতানি হয়। অন্যান্য রাজ্যের ফল-প্রক্রিয়াকরণ কারখানাতেও এখানকার প্রচুর আম যায়। ঘরোয়া ভাবে অনেক মানুষ আমজাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

শুধু অর্থনীতিতেই নয়, বরিন্দের সামাজিক জীবনেও আম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আদিবাসীরা লাঠির পাতায় আমপাতা বেঁধে জরুরি আলোচনার জন্য জড়ো হওয়ার সংকেত দেন। ভিন এলাকার স্বজন-বন্ধুদের আম পাঠিয়ে এখানকার মানুষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। স্কুল-কলেজের গরমের ছুটিকে এখনও এখানে আমের ছুটি বলা হয়। এই এলাকার সাহিত্যেও আম একটি

বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। 'ফজলি' পত্রিকার আমকেন্দ্রিক নামকরণে তা স্পষ্ট। আর বরিন্দের বেশির ভাগ কবিই আম নিয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন।[১]

মালদহের টাঙন অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক অজানা দিক উন্মোচনের প্রয়াস প্রদর্শন করা হল। অতি আংশিক হলেও, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বর্ণময় ও সীমাহীন ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা নবস্পন্দন জোগাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. ফজলি, আম সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৪১২, সম্পাদনা: নির্মলেন্দু শাখারু, অতিথি সম্পাদক: ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, গাজোল, মালদহ থেকে প্রকাশিত। এই সংখ্যাটিতে আম নিয়ে ৩০ জন কবির ছড়া-কবিতা, দু-জন লেখকের গল্প ও ছয় জন লেখকের প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকার তালিকা :

১. গৌড়ের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), — রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সম্পাদনা: ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ (জানুয়ারি ১৯৯৯)

২. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ

৩. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২

৪. পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিচয় গ্রন্থমালা ১, মালদা — সিদ্ধার্থ গুহ রায়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৭৩

৫. পায়ে পায়ে হাজার বছর — শিবেন্দুশেখর মিশ্র, ডিসেম্বর ২০০৬, উত্তরণ পুস্তক মন্দির, বুলবুলচণ্ডী, মালদহ

৬. গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শিকা, ২য় সংস্করণ, সম্পাদনা: ড. ফণী পাল, লোকসংস্কৃতি পরিষদ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪

৭. সাবেক উত্তরবঙ্গ: সাহিত্য সাহিত্যিক রেখালেখ্য —সুধীরকুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৬, মালদহ, প্রকাশক: লেখক নিজেই

৮. গাজোল গাইড — ২০০১, অ্যাড সেন্টার, গাজোল, মালদহ

৯. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ

১০. গৌড়বার্তা ১৪০৫, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, মালদহ থেকে প্রকাশিত

১১. জানা অজানার মালদহ — ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ, মালদহ

১২. বেদনার বালুচর, মুহা. আব্দুল ওয়াহাব, জানুয়ারি ২০০৭, ক্রিসেন্ট পাবলিকেশন, গাজোল, মালদহ

১৩. সিদ্দিকুল্লাহ ও মুসলমান, ফিরোজ সরকার মুন্না, ১ বৈশাখ ১৪১৫, প্রকাশক: লেখক নিজেই

১৪. মহাপ্রাণ, স্বামী গিরিজাত্মানন্দ, ১ম সংস্করণ, ১২ জানুয়ারি ২০০৪, প্রকাশক : অরুণকুমার মণ্ডল, সম্পাদক: গাংগুরিয়া শ্রীশ্রীসারদাতীর্থম, মালদহ

১৫. ধর্মের আড়ালে ঢাকা ইতিহাসের কিছু কথা, জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহেশপুর, মালদহ থেকে প্রকাশিত

১৬. গাজোলের ইতিকথা, কালীপদ সরকার, ১ম প্রকাশ, ২ অক্টোবর ২০০১, প্রকাশক: আশুতোষ সরকার, গাজোল, মালদহ

১৭. তরঙ্গ, ১ম (জানুয়ারি ২০০৩) ও ২য় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০০১), পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত

১৮. কোজাগরী, জানুয়ারি ২০০৪, ২০০৯, পাকুয়াহাট, মালদহ থেকে প্রকাশিত

১৯. দীপশিখা, ৪র্থ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৪, নালাগোলা, মালদহ থেকে প্রকাশিত

২০. সাহিত্য শরণি, ৩য় বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ১৯৯০, বুলবুলচণ্ডী মালদহ থেকে প্রকাশিত

২১. কোজাগরী সাহিত্য উৎসব, ৩য় বর্ষ ২০০২, পাকুয়াহাট মালদহ থেকে প্রকাশিত

২২. জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ আগস্ট ২০০২ ও ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বারোমাইল, বিনোদপুর মালদহ থেকে প্রকাশিত

২৩. আঞ্চলিক ভাষার কবিতা ২০০২, সম্পাদনা: মধুমঙ্গল বিশ্বাস। দৌড় প্রকাশনা, মিলনপল্লী, উত্তর চব্বিশ পরগনা।

২৪. সাহিত্যসঙ্গ, ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, গাজোল থেকে প্রকাশিত

২৫. ছুটি সাহিত্যবাসর ২০০৮, মালদহ থেকে প্রকাশিত

২৬. যাদুসোনা, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা গাজোল থেকে প্রকাশিত

২৭. উত্তরণ সাহিত্য ১৯৯৮, গাজোল থেকে প্রকাশিত

২৮. ফজলি, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪০৮, শারদ সংখ্যা ১৪০৭, শারদ সংখ্যা ১৪০৯ ও গ্রীষ্ম ১৪১২, গাজোল থেকে প্রকাশিত

২৯. অর্ঘ্য, বুলবুলচণ্ডী থেকে প্রকাশিত

৩০. অর্ঘ্য, (চন্দ্রাবতী সাহা বিদ্যাপীঠের পত্রিকা) ২য় সংখ্যা, চাঁদাহার থেকে প্রকাশিত

৩১. টাঙনের ঢেউ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৪, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত

৩২. উজ্জ্বলনীলমণি, সংখ্যা ১, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ থেকে প্রকাশিত

৩৩. গাজোল মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ২০০৬-'০৭ ও ২য় সংখ্যা ২০০৮-০৯

৩৪. একালের ধৃতি, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-২৪ সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত

৩৫. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০

৩৬. The Folk Element in Hindu culture — Binay Sarkar.

৩৭. Art in stone : A catalogue of Sculptures in Malda Museum — Malayshankar Bhattacharyya, 1982, Malda Museum, Malda

৩৮. মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল — সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তররঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৪

৩৯. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ

৪০. সেমিনার নিবন্ধাবলী : বাংলার লৌকিক অভিকরণ শিল্পকলা ও লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্র, ফেব্রু. ২০০৮, ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোশিয়েশ্যান অব ইন্ডিয়া

৪১. রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, দ্বিতীয় নিউ এজ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯

৪২. উত্তরপর্ণা, মালদহ মহিলা মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৯৮, মালদহ

৪৩. জগজীবনপুর — অমল রায়, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২

৪৪. গৌড় মালদা সংবাদ, শারদীয়া ১৪১০, মালদহ

৪৫. 'যুগান্তর' পত্রিকা, ৯ মার্চ ১৯৯৪ ও ১৫ মার্চ ১৯৯৪

৪৬. মালদহ সমাচার, বর্ষ ১০৪, সংখ্যা ২, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮৮ ও ৮৭ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা, ৫ মে ২০০৪, বাঁধ রোড, মালদহ থেকে প্রকাশিত

৪৭. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৪, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত

৪৮. বাংলার লোকসাহিত্য — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩য় খণ্ড ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা-৭৩

৪৯. কেরি স্মৃতি, স্বপনকুমার চক্রবর্তী, ২৬ জানুয়ারি ২০০৬, নালাগোলা থেকে প্রকাশিত

৫০. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ

ব্যক্তিঋণ :

১. বনমালী বর্মন, গাজোল প্রেস ক্লাব, গাজোল, মালদহ
২. বীরেন্দ্রনারায়ণ শুকুল, প্রাক্তন শিক্ষক, আইহো, মালদহ
৩. সঞ্জীবকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক, মালদহ সমাচার, বাঁধ রোড, মালদহ
৪. স্বদেশ বর্মন, মালদহ প্রেস ক্লাব, মালদহ
৫. সত্যনারায়ণদেব ভার্মা, সম্পাদক, গৌড়বঙ্গ প্রেস ক্লাব, মালদহ
৬. নিমাই চক্রবর্তী, গাজোল মহাবিদ্যালয়, মালদহ
৭. সুখেন্দু দাশ, সহ-অধিকর্তা, সংবাদ বিভাগ, কলকাতা দূরদর্শন
৮. শ্রীকৃষ্ণদেব ভার্মা, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সারিমেন অ্যাসোসিয়েশন, গাজোল, মালদহ
৯. মৌটুসী মিত্র, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ
১০. পার্থ সারথী বসাক, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ
১১. প্রবাল লালা, সংস্কৃতিকর্মী, মধ্যম কেন্দুয়া, বুলবুলচণ্ডী, মালদহ
১২. গোপাল সূত্রধর, চিত্র সংগ্রাহক, ই-টিভি নিউজ (বাংলা), গাজোল, মালদহ

Nikhil Ch. Ray
24.12.2009

Gourangadeb Varma
24/12/2009

LIBRARY NBU, DARJEELING